TO

HIS HIGHNESS

HON'BLE THE MAHARAJAH LAKSHMISWARA

SINCHA BAHADOOR

*OF DURBHUNGAH*

This work is dedicated with profound respect

by his most humble servant,

CHANDRA SEKHARA BASU

*AUTHOR.*
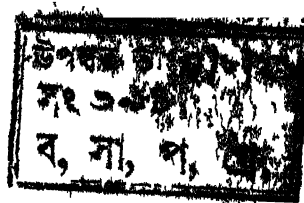
# হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ।
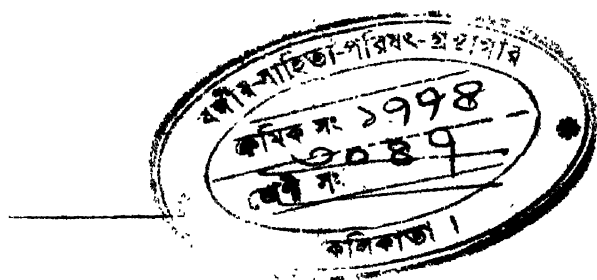
গ্রন্থকার ও প্রকাশক

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।



শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক

গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।

২২১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

১২৯১ চৈত্র।

## শুদ্ধিপত্র ।

| পত্র | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৫ | ১৪ | উন্নত | উন্নত |
| ঐ | ১৭ | উদ্দেশে | উদ্দেশে |
| ৮ | ২০ | শাস্ত্রমুলক | শাস্ত্রমূলক |
| ৪৬ | ৩ | অনুভুত | অনুভূত |
| ঐ | ঐ | ভারত-সমাজ | ভারত-সমাজ ও |
| ৭২ | ৯ | পারিতেছে | পারিতেছেন |
| ৯১ | ৬ | "বক্তা" এই অক্ষর দুটী কাটিয়া ফেল | |
| ৯৬ | ২৩ | বেদমুলক | বেদমূলক |
| ৯৮ | ২৪ | কম্মকাণ্ড | কর্ম্মকাণ্ড |
| ১০৭ | ১৪ | কেবল্য | কৈবল্য |
| ১০৯ | ১১ | নিরুপাধিক | নিরুপাধিক, |
| ১১৫ | ৭ | হয়। | হয়"। |
| ঐ | ১২ | "ব্রত | ব্রত |
| ১২১ | ১৭ | ঈশ্বরতত্ত্ব | ঈশ্বরতত্ত্ব |
| ঐ | ১৯ | পরম্পরাগত | পরম্পরাগত |

# হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ।

## প্রথম খণ্ড।

## বৈদিকধর্ম্ম ও শাস্ত্রসমন্বয়।

## নির্ঘণ্ট।


| প্রকরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| উপক্রমণিকা ... ... ... | ১ |
| প্রথম অধ্যায়—মূলকাণ্ড ... ... | ১১ |
| দ্বিতীয় অধ্যায়—বিধিকাণ্ড ... ... | ১৭ |
| তৃতীয় অধ্যায়—অনুমানকাণ্ড ... ... | ২৫ |
| চতুর্থ অধ্যায়—যোগকাণ্ড ... ... | ২৭ |
| পঞ্চম অধ্যায়—জ্ঞানকাণ্ড ... ... | ৩০ |
| ষষ্ঠ অধ্যায়—নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ... ... | ৩৩ |
| সপ্তম অধ্যায়—সগুণব্রহ্মজ্ঞান ... ... | ৪১ |
| অষ্টম অধ্যায়—নিষ্কামকর্ম্ম ... ... | ৬২ |
| নবম অধ্যায়—কর্ম্মব্রহ্ম সমন্বয় ... ... | ৭৮ |
| দশম অধ্যায়—দেব সমন্বয় ... ... | ৮৭ |
| একাদশ অধ্যায়—শাস্ত্র সমন্বয় ... ... | ৯৬ |
| উপসংহার ... ... ... | ১২১ |

# হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ।

---

প্রথম খণ্ড।

---

## বৈদিকধর্ম্ম ও শাস্ত্রসমন্বয়।

## উপক্রমণিকা।

সর্ব্ব কর্ম্মের ফলদাতা শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

এই বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক ধর্ম্মের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এক দিকে সহৃদয় ব্যক্তিগণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ বিস্তার করিতেছেন। অন্যদিকে বিস্তর হিন্দু সন্তান হিন্দুধর্ম্ম পালনে উৎসাহী হইয়াছেন। ইংলণ্ডীয় বিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা প্রথমে যে সকল যুবা-বঙ্গবাসির চিত্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিগতশ্রদ্ধা হইয়াছিল, তাঁহারা ক্রমে তাহার মনোহারিতা, সত্যতা, উপকারিতা ও উপাদেয়ত্ব কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইতেছেন। কোনরূপ সংক্ষেপসিদ্ধান্তের সহিত কর্ম্মব্রহ্ম বিশিষ্ট হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব জ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সমাজ-বিপ্লবকারী কতিপয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের নানা অবয়ব আক্রমিত হওয়াতে হিন্দুধর্ম্ম-প্রেমী অনেকেই হিন্দুধর্ম্মরক্ষণের অনুকূল শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই সকল

জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের যৎকিঞ্চিৎ উপকারার্থে আমরা সম্প্রতি বেদমূলক কর্ম্মব্রহ্মাত্মক্ কতিপয় সিদ্ধান্তের ও শাস্ত্রার্থের বিবরণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা করি প্রাগুক্ত প্রকার অধিকারী সমস্ত-বঙ্গবাসীই তাহা মনোনীত করিবেন।

শুদ্ধ ঐ প্রকার উদ্দেশ্যই এই উপস্থিত প্রবন্ধের জনক নহে। এই বর্ত্তমান কালে কতিপয় যুবা-বঙ্গবাসী ভারতবর্ষের সামাজিক ধর্ম্মে নানা পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করিতেছেন। ইওরোপীয় বিদ্যা অধ্যয়নে তাঁহাদের বুদ্ধি যেরূপ প্রকৃতি দ্বারা বিরচিত হইয়াছে তাহাই তাঁহাদের উক্ত ইচ্ছার প্রসূতী। ঐ ইচ্ছাকে যেরূপ বেগবতী দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে যিনি তাহার গতিরোধের যত্ন করিবেন তাঁহার যত্ন যে নিষ্ফল হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ তাঁহারা মানুন আর নাই মানুন, শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাঁহাদের যে সকল মতিভ্রম স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা উপদেশ দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া ভারতের প্রকৃত কল্যাণকামী শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কেননা তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী উক্ত যুবাগণের উপকার না হইলেও হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিপালনেচ্ছু সহস্র সহস্র ব্যক্তির বিশেষ উপকার হইবে।

কিন্তু আমাদের উক্ত নব্য ভ্রাতারা সকলেই কৃতবিদ্য, সত্যানুরাগী, জ্ঞানপিপাসু ও পঠন-পটু। এজন্য আমরা ভরসা করিতে পারি যে, আমাদের শাস্ত্রীয় উপদেশগুলি পাঠ পূর্ব্বক তাঁহারা অন্ততঃ হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে শাস্ত্র স্বয়ং কি বলেন তাহা অবগত হইবেন। কেননা আমরা বার বার দেখিয়াছি যে তাঁহারা স্ব স্ব বক্তৃতা ও লিখিত প্রস্তাব সমূহে হিন্দুধর্ম্মের মত বলিয়া যাহা দর্শাইয়াছেন তাহার অধিকাংশই অনুমান

মাত্র—শাস্ত্রীয় নহে। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন ও হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ রক্ষা যদি না করেন সে তাঁহাদের ইচ্ছা। কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়া তাহার অর্থসঙ্কোচ করা বড়ই দোষ। ভরসা করি আমাদের উপস্থিত উপদেশগুলি পাঠ করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রার্থ সংগ্রহে যত্ন করিবেন এবং উপ-রিউক্ত দোষের সংশোধন করিবেন। আমাদের উপদেশ গুলি যে অবিকল শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে একথা বলিতে আমরা যোগ্য নহি। ফলতঃ কেবল শাস্ত্রসঙ্গত উপদেশ প্রদানই আমাদের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা সফল হইবে কিনা তাহা টোল চতুষ্পাঠির অধ্যাপক ও শাস্ত্রজ্ঞ-সন্ন্যাসীগণই বলিতে যোগ্য। আমরা তাঁহাদিগকে তদ্রূপ যোগ্য বলিয়া মানি এবং আমাদের হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ভ্রাতারাও তাঁহাদিগকে সেরূপ যোগ্য বলিয়া না মানেন এমত নহে। আমরা হিন্দুধর্ম্মের যে সকল উপদেশ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার শাস্ত্রসিদ্ধতার প্রতি যদি তাঁহাদের কোন সন্দেহ হয় তবে তাঁহারা ঐরূপ অধ্যাপক প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞগণের নিকট হইতে তাহা বুঝিয়া লইলেই সন্দেহ মিটিবে। সারকথা এই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি ও শাস্ত্রের মর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞ থাকা অথচ হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র লইয়া তর্কাদি করা কাহারই কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী ভ্রাতাগণকে কেবল যে আমরা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত জানিতেই অনুরোধ করি এমত নহে। তাঁহারা অনেকেই নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ও বুদ্ধি-মান্। তাঁহারা যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারেন তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বুঝিতে পারিবেন। আমাদের ক্রমশঃ বিবৃত উপদেশ সমূহের শাস্ত্র-

সিদ্ধতার প্রতি যদি তাঁহাদের শ্রদ্ধা হয় তবে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের সামাজিক হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্ব-প্রকার অধিকারির উপযুক্ত, ভারতের প্রকৃত কল্যাণ-সাধক; ঋষিগণের যে পবিত্র শোণিত অদ্যাপি আমাদের শরীরে প্রবাহিত হইতেছে তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য, এবং প্রত্যেক ভারত-সন্তানের সহজ বুদ্ধির অনুগত ও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের সোপান স্বরূপ।

সহৃদয় ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে ইহা অনুভব করা কঠিন নহে যে উন্নত ঈশ্বরজ্ঞান বিশিষ্ট কোনরূপ ধর্ম্মই কোন সমাজের সর্ব্বসাধারণ লোকের উপযুক্ত হয় না। মার্জ্জিত-বুদ্ধি উন্নত ও জ্ঞানী লোকেরা তাদৃশ ধর্ম্ম অবশ্যই ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ জনসমাজ তাহার নিম্ন-দেশে অবস্থান করিবেই। তাদৃশ উন্নত ধর্ম্মে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলেও তাহারা তাহা প্রতিপালন করিতে পারিবেনা। তাহারা আপনাদের সাংসারিক অবস্থা, বিদ্যাবুদ্ধির শক্তি, কামনার প্রকারভেদ প্রভৃতির অনুযায়ী সেই উন্নত ধর্ম্মকে অবনত করিবেই। তাহাদিগকে সহস্র উপদেশ দেও ঈশ্বরের মূর্ত্তি নাই তাহাদের মনে সে উপদেশ মুদ্রিত হইবে না। জগদীশ্বরের জগৎ মূর্ত্তিময়—তাহাদের স্বীয় হৃদয় ও মন মূর্ত্তিময়—অতএব তাহারা কিরূপে রূপের অতীত পদার্থকে ধারণ করিবে? তাঁহাকে মহাজন-প্রতিষ্ঠিত বা স্বকপোলকল্পিত কোন একটী মূর্ত্তির যোগে দর্শন না করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবেক? ঈশ্বরপরায়ণ উন্নত সাধুগণ ঈশ্বরের নিকট কোন পার্থিব সম্পৎ প্রার্থনা করেন না। কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন। কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা করিতে অপারগ। তাহারা রোগ শোক ও অভাবের জ্বালায় অস্থির। অতএব

সে সমস্ত দুঃখ উপশমের নিমিত্ত ঈশ্বরকে না ডাকিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। উন্নত ব্রহ্মজ্ঞের বিশ্বাস এই যে ঈশ্বর একভিন্ন দুই নহেন। তিনি হয়ত জানেন যে ঈশ্বরকে নানারূপে বিভক্ত করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সাধারণ জনসমাজ সে শাসনে আবদ্ধ থাকিতে অসমর্থ। তাহারা ইহা জানে বটে যে একজন সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর আছেন। কিন্তু তাঁহাকে পূজা করিবার সময় তাহারা তাঁহাকে নানা ফলের সহিত নানা ভাবে ও নানা রূপে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞানী ঈশ্বরপরায়ণ ঈশ্বরকে কোন দ্রব্য নিবেদন করা প্রয়োজনীয় বোধ করেন না। কেন না তিনি জানেন ঈশ্বর আহার করেন না, বস্ত্রপরেন না। তিনি জানেন যে ঈশ্বর ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত। তিনি জানেন যে ঈশ্বরকে কেবলমাত্র আত্মনিবেদন করিতে হয়। কেবল মাত্র প্রাণ মন জীবন তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হয়। কিন্তু সাধারণ জনসমাজ এ প্রকার উন্নত উপাসনায় সমর্থ নহে। সেরূপ পূজা তাহাদের প্রীতিকরও নহে। তাহারা আত্মমতে তাঁহার সেবা করিতে ভালবাসে এবং তদনুসারে প্রাণ ভরিয়া অন্নবস্ত্র ভোজন পাত্রাদি তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হয়। জ্ঞানিরা সকল দিনকেই সমান পবিত্র জ্ঞান করেন। সকলদিনই একাকী বা সাধুসঙ্গে বিনা আড়ম্বরে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা করিতে পারগ নহে। তাহারা শিষ্টপরম্পরা প্রতিষ্ঠিত পর্ব্বদিনে, গ্রহনক্ষত্রের যোগাদিসময়ে, পুত্রজন্মাদি উপলক্ষে অথবা আপনাদের স্বকপোলকল্পিত উৎসব-বাসরে মহা ঘটা করিয়া ঘটে, পটে, প্রতিমায় তাঁহার পূজা করিতে উৎসাহী হয় এবং উৎসব স্থলে জাজ্বল্যমানরূপে তাঁহার পবিত্র ও মঙ্গলজনক অধিষ্ঠান অনুভব করে।

জ্ঞানীপুরুষদিগের ও সাধারণ জনসমাজের এই প্রকার বিভিন্ন অধিকার প্রকৃতিমূলক। তাহাকে অভিন্ন ও একাকার করা কাহারই সাধ্য নহে। খ্রীষ্টধর্ম্মে, মহম্মদীয়ধর্ম্মে, হিন্দু-ধর্ম্মে সর্ব্বত্রেই এই প্রকৃতির তারতম্য দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে বিস্তর লোক কোন না কোন প্রকারে মূর্ত্তিপূজা করিয়া থাকে। খ্রীষ্টরাজ্যে যাঁহাদের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা নিষেধ তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত দুর্ব্বলাধিকারিগণ অন্ততঃ মনেতেও ঈশ্বরের কোন না কোন প্রকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লয়। তাহা না করিলে তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ তাহারা সেরূপ মূর্ত্তি কল্পনা অশাস্ত্র করে না, কেন না তাহাদের বাই-বেলে প্রমাণ আছে যে পূর্ব্বকালে ঈশ্বর মেঘ হইতে যজমান-দিগের যজ্ঞপ্রাঙ্গণে অবতরণ করিতেন। তদ্ভিন্ন স্বয়ং খ্রীষ্টই খ্রীষ্টানগণের মূর্ত্তিমান দেবতা। তাঁহারা সেই খ্রীষ্টের মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা না করুন, কিন্তু ইহা জানেন যে তাঁহার সত্য সত্যই শরীর ও জীবনকাল ছিল। সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি মানিয়া থাকেন। এদেশের অনেক ফিরিঙ্গী-স্ত্রীলোকেরা সময় বিশেষে পঞ্চানন, কালী, শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবির পূজা করিয়া থাকে। পূর্ব্ববাঙ্গালায় অনেক খ্রীষ্টান-ফিরে হিন্দু হইয়াছে। তথাকার জনৈক পাদরী কোন স্থানে গ্রামশুদ্ধ চণ্ডালদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। দীক্ষিত হইয়াও তাহারা পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী বারএয়ারী পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই কথা শুনিয়া পাদরী সাহেব আসিয়া তাহা-দিগকে সয়তান ও নরকাগ্নির বিস্তর ভয় দেখাইলেন। কিন্তু তাহারা উত্তর করিল—ধর্ম্মাবতার! খ্রীষ্টধর্ম্মে কি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে নিষেধ? এ বারএয়ারী পূজা ধর্ম্ম কর্ম্ম মাত্র। আমরা

যদি অগ্রে জানিতাম যে তোমার মতে ধর্ম্ম করিতে নাই, তবে আমরা তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। মুসলমানদিগের মধ্যেও এই ভাব। তাহারাও অনেক স্থলে পর্ব্ববিশেষে হিন্দু দেবদেবির পূজা দেয়। মুসলমান ধর্ম্মে যদি তাজীয়া, হোসেনের ব্রত, ও অসংখ্য অসংখ্য দর্‌গা ও পীরপয়গম্বরের প্রতিষ্ঠা না থাকিত তবে সাধারণ মুসলমান সমাজের বড়ই দুরবস্থা হইত। তাহারা তাহাদের উচ্চজ্ঞানী সুন্নি ও সুফীদিগের ন্যায় কখনই আচরণ করিতে পারিত না।

মূল কথা এই যে জনসমাজে ধর্ম্মের উন্নত ও অবনত এই দ্বিবিধ অধিকার সার্ব্বভৌমিক। ধরণির মধ্যে কেবল একমাত্র বেদমূলক-হিন্দুধর্ম্মে ঐ উভয় অধিকারই আদরলাভ করিয়াছে। ভারত সমাজের মধ্যে এই স্বাভাবিক সার্ব্বভৌমিক অধিকারের মর্য্যাদা রাখা হিন্দুজ্ঞানিদিগেরই বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেন না হিন্দুসমাজের পক্ষে তাহা নূতন ব্যবস্থার ন্যায় প্রচার করিতে হইবেনা। এখনকার জ্ঞানিরা যদি সাধারণ হিন্দুসমাজকে স্বীয় উন্নত মতে আনিতে চান তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক ও অযোগ্য চেষ্টা হইবে। তাঁহারা যদি সাধারণ জনসমাজ হইতে বহির্ভূত হইয়া আপনাদের মনের মত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে একেবারে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় পত্তন করেন তাহাও দেশের ও তাঁহাদের নিজের মঙ্গলকর হইবেনা। তাহাতে তাঁহাদের নিকটে দেশের লোক পর হইবে এবং দেশের লোকের নিকট তাঁহারা বিজাতীয়রূপে গণ্য হইবেন। ভবিষ্যতে কি হইবে কেহ বলিতে পারেনা। যদি কিছুদিন পরে তাঁহাদের বংশের সন্তান সন্ততিগণ মূর্খ ও অজ্ঞানী হয় তবে তাহারা তখন তাঁহাদের উচ্চধর্ম্মকে ধারণ করিতে অপারগ

হইবে। তখন তাহারা হয় সাধারণ জনসমাজের ধর্ম্মে অবতরণ করিবে, নয় নবতর স্থূলধর্ম্ম কল্পনা করিবে, না হয় একপ্রকার নাস্তিক হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু তাহাদের পক্ষে কেবল জাতি যাওয়া মাত্রই সার হইবে।

যদি বলা যায় যে এ দেশীয় জ্ঞানিরা আপনাদের উন্নত জ্ঞান-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক কেবল কনিষ্ঠ-হিন্দুধর্ম্মেরই সেবা করুন সেকথাও সম্পূর্ণ অযুক্ত হইবে এবং তাহাতে দেশেরও অহিত হইবে, শাস্ত্রেরও মর্য্যাদা থাকিবে না। তাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ-মার্গ রুদ্ধ হইয়া দেশ মধ্যে কেবল অজ্ঞানতাই বিরাজ করিবে। অতএব যাহাতে যুক্তিপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞাননিষ্ঠ, ব্রহ্মোপাসক ও যোগাচারীগণের উন্নত অধিকারের ব্যাঘাৎ না হয়; যাহাতে আবার পক্ষান্তরে সাধারণ জনসমাজকে বলসহকারে বুদ্ধি ভেদপূর্ব্বক তাহাদের অধিকারের অতীত উচ্চধর্ম্মে আনিতে না হয়; যাহাতে উন্নত অধিকারীগণ নিম্নাধিকারীগণের সহিত একই সামাজিক ধর্ম্মে—একই সুধাময় ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান, উপাসনা ও লোকাচারের সাধন করেন; যাহাতে শাস্ত্র, শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমন্বয়জনিত আত্মতুষ্টির মর্য্যাদা রক্ষা পায় এবং যাহাতে ধর্ম্ম লইয়া দেশমধ্যে অনর্থক একটা বিরোধ না হয় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুদৃঢ় উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাদৃশ উপায়াবলম্বন ব্যতীত হিন্দুসমাজে কোন বিষয়ে একতা সিদ্ধ হইবে না।

হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে এবং আমাদের শাস্ত্রমুলক বিচারে কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের মহতাশ্রয়ে থাকাই সেই প্রকৃষ্ট ও সুদৃঢ় উপায়। কেন না তাহাতে কর্ম্মকাণ্ড,

ব্রহ্মকাণ্ড, যোগকাণ্ড, প্রভৃতি সমস্তই আছে এবং কর্ম্মী, অজ্ঞানী ও জ্ঞানির পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিভেদে অথচ সকলের একত্রে সামাজিক দেবার্চ্চনা প্রভৃতি আচরণের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত আমরা প্রণালী পূর্ব্বক তাহাই প্রতিপাদন করিব। তৎসম্বন্ধে যাহা আমাদের নিজের বক্তব্য তাহাও যথাস্থানে নিবেদন করিব।

শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সকল প্রায়ই দার্শনিক। তৎসমূহ প্রায়ই সর্ব্বশাস্ত্রীয় মতের সহিত পরস্পর সমন্বিত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অনুকূল ও প্রতিকূল যে সমস্ত মহাত্মাগণের উদ্দেশে আমরা উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম তাঁহারা সকলেই প্রায় বিদ্বান্ ও উৎকৃষ্টরূপে পঠনক্ষম। ভরসা করি তাঁহারা আমাদের উপদেশ সমূহের মধ্যে উক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকল এবং গুণবাদ ও নিন্দার্থবাদ সমূহ ভেদ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম ও সমাজসংস্কারেচ্ছু তাঁহারা আপনাদের সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে স্বতন্ত্র পদে স্থিতি পূর্ব্বক বিচার করিয়া বুঝিবেন, শাস্ত্র যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা উপাদেয় কিনা। আমরা বেশ বুঝি যে, যৎকিঞ্চিৎ শাস্ত্রের পঠন বা শ্রবণ মনন না থাকিলে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সকল প্রায়ই জটীল বোধ হয়। ফলে এই সকল উপদেশ পাঠে উৎসাহী হইয়া যদি কাহারো শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা শ্রবণে মতি হয় তবে ক্রমে সকল সন্দেহই ভঞ্জন হইবেক।

আমরা বক্ষ্যমাণ উপদেশ সমূহে সম্প্রতি কেবল হিন্দুধর্ম্মের সকাম, নিষ্কাম, ঈশ্বরার্থ, এবং লোকশিক্ষার্থ প্রভৃতি

ভেদে কর্ম্মকাণ্ডীয় তত্ত্ব সকল ; স্বগুণ, নির্গুণ ভেদে জ্ঞান বা ব্রহ্মকাণ্ডীয় তত্ত্বসকল ; এবং বেদ অবধি তন্ত্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব-শাস্ত্রের সংক্ষেপ বিবরণ ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ সহকারে উপরি-উক্ত তত্ত্ব সমস্ত প্রতিপাদন করিব। তদ্দ্বারা পাঠকগণ ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের আপাততঃ প্রয়োজনীয় সমস্ত অবয়ব জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থ যুক্তং বচনং প্রমাণং।
যস্য প্রমাণং নভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং"।

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদিতে যে ব্যক্তির প্রামাণ্য নাই তাহার বাক্য কি প্রকারে বিজ্ঞলোকের গ্রাহ্য হইতে পারে।

(গোস্বামির সহ বিচারে রাঃ মোঃ রাঃ)

# বৈদিকধর্ম্ম ও শাস্ত্রসমন্বয়।

## প্রথম অধ্যায়।

### মূলকাণ্ড।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ" (কঠ ২।২) 'শ্রেয়ঃ' আত্মজ্ঞান জনক নিবৃত্তি-ধর্ম্ম এবং 'প্রেয়ঃ' শরীরাদি রক্ষার্থ প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্ম মনুষ্যকে অধিকার করে। "দ্বেবিদ্যে বেদিতব্য" (মুণ্ডক ১।১।৪) বেদোক্ত দ্বিবিধ বিদ্যা জানিবার যোগ্য। এক পরমাত্ম-বিদ্যা, দ্বিতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তৎফল বিষয়ক বিদ্যা। "প্রবৃত্তঞ্চনিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং" (মনু ১২।৮৮) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ বৈদিক ধর্ম্ম। "দ্বিবিধোহি বেদোক্তো-ধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তি লক্ষণোনিবৃত্তি লক্ষণশ্চ। তত্রৈকোজগতঃ স্থিতিকারণং,প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয় সহেতুর্যঃ সধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়ার্থিভিরনুষ্ঠীয়মানোদীর্ঘেণ কালেন।" (গীঃ শাঙ্করভাষ্যোপক্রমণিকা) বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ। প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ। প্রথমটী জগতের স্থিতির কারণ, দ্বিতীয়টী ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান প্রাণিগণের সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু।

বেদই একমাত্র সনাতন ও মূল শাস্ত্র। নর-স্বভাবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই ধর্ম্ম বিরাজ করে। তন্মধ্যে প্রবৃত্তি প্রেয়ঃ এবং নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ। প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম সংসার-সাধক। নিবৃত্তি-ধর্ম্ম বিবেক ও বৈরাগ্য-জনক এবং মোক্ষ-প্রদ। মোক্ষ সংসারের অতীত পদার্থ। মোক্ষে আর ব্রহ্মে অভিন্ন। নরস্বভাবের এই দ্বিবিধ অধিকার ভেদে বেদশাস্ত্র প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইকাণ্ডে বিভক্ত। উভয় কাণ্ডই স্বাভাবিক। তাহা বিশুদ্ধ-নরস্বভাবের আদর্শ,মানবপ্রকৃতি রূপ নিত্যধর্ম্মের ব্যবস্থা,বারম্বার প্রলয় ও সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রবাহরূপে নিত্য এবং অনাদি কালাবধি পরমেশ্বরের অনাদি সৃষ্টি-শক্তি দ্বারা সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত। পরম-

পিতা পরমেশ্বরের সেই অনাদি নিয়ম-সূত্রে তাহা প্রত্যেক নব-সৃষ্টিতে নিষ্পাপ-স্বভাব সাধু মহর্ষিগণের হৃদয়গত জ্বলন্ত প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যপূর্ণ নিবৃত্তি-ধর্ম্ম হইতে ভাবার্থযুক্ত বাণী স্বরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ প্রস্থান ভেদে অবতীর্ণ হইয়া শুভকর্ম্মকুশল ও জ্ঞানপথাবলম্বী ভারতবাসীগণকে শাসন করিয়া থাকে।

সত্যযুগে যখন প্রাচীন শুভাদৃষ্ট বলে সরলতা ও সত্য মানবের প্রধান ধর্ম্ম ছিল, তখন সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কাণ্ড-দ্বয় বিশিষ্ট বেদ-প্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্ম চারিপাদে পূর্ণ ছিল। তখন তাহার প্রবৃত্তি-কাণ্ডাবলম্বীগণ জ্বলন্ত ঈশ্বরকেই ফলরা-জ্যের বিধাতারূপে দৃষ্টি করিতেন। ঘটাবচ্ছিন্ন বা মঠাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় তাঁহারা তখন ঈশ্বরকে প্রাকৃতিক শোভা ও সম্পদের বিভাগ বিশেষে জীবন্তভাবে পরিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত দেখিতেন। তত্তদ্বিভাগানুসারে তাঁহাদের সরল মানস-নেত্রে সেই একই ঈশ্বর সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি নামরূপে প্রকাশ পাইতেন। বাসনা ও প্রার্থনার ভিন্নতা হেতু সেই একই ঈশ্বর নানা দেবতা রূপে তাঁহাদের প্রার্থনা রূপ বেদবিহিত মন্ত্রারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিত কর্ম্মফল দান করিতেন।

সত্যযুগে নিবৃত্তিধর্ম্ম রূপ জ্ঞানকাণ্ডও অনেকের আশ্রয়-স্থান ছিল। তখন তদবলম্বী মহর্ষিগণের বাসনাক্ষয় হেতু কোন সাংসারিক সুখসম্পদের প্রার্থনা ছিল না। নানা প্রার্থনা-জনিত চিত্ত-বিক্ষেপ না থাকায় তাঁহারা ঈশ্বরকে অখণ্ড ব্রহ্ম ভাবে দর্শন করিতেন। দেহ, মন প্রভৃতিতে আত্মাধ্যাস বিগত হওয়ায় সেই ব্রহ্মকেই অদ্বয় আত্মারূপে সাক্ষাৎ করি-

তেন। তাঁহারা সেই নির্ম্মল অদ্বয় জ্ঞানানন্দে মগ্ন হইয়া বাহ্য ও আন্তরিক উপাধি, রূপ, নাম, বিশেষণ বর্জন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মই দর্শন করিতেন।

কিন্তু মানবকুলের দুরদৃষ্ট বশতঃ, সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রূপ বৈদিক ধর্ম্ম যুগক্ষয় নিবন্ধন পাদহীন হইল। তাহার জীবন্ত ভাব বিনাশ প্রাপ্ত হইল। জনসমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে লাগিল। লোক সকল চতুর্দ্দিকে বিলাসপ্রিয়, অলস, নিরুদ্যম, স্বার্থপরায়ণ, ব্রহ্ম-দ্বেষী এবং তার্কিক হইয়া উঠিল। অনেক আর্য্য স্বেচ্ছাচারের স্রোতে ভাসমান হইয়া ভারতবর্ষাতীক্রম পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। অনেকে মধুর ব্রহ্মনাম ও বৈদিক-ক্রিয়া ত্যাগ করত পুরুষ-বুদ্ধি-মূলক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া গেলেন। এইরূপে সেই পূর্ব্বকালে ফল-প্রদ কর্ম্মকাণ্ড এবং মোক্ষপ্রদ জ্ঞান-কাণ্ডের সজীবভাব নষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। তখন পরমেশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম ও তন্নিয়ন্তৃত মানবগণের অদৃষ্টানুসারে পরম-কারুণিক মহর্ষিগণ কটিবন্ধন পুরঃসর ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত নানা উপায় উদ্‌ভাবন করিলেন। অধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, অবিবেক, অজ্ঞানতা ও অনাত্মজ্ঞান কর্ত্তৃক ভারত-সমাজ উচ্ছিন্ন না হয়; এই উদ্দেশে ঋষিগণ লোকের অদৃষ্ট অধিকার ও রুচি অনুসারে বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিপালনের নানা প্রকার ব্যবস্থা করিলেন।

যে সকল শাস্ত্রদ্বারা তাঁহারা ঐরূপ ব্যবস্থা সকল করিলেন, তৎসমূহকে আমরা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। §

---

§ প্রকৃত প্রস্তাবে এবং মুখ্যকল্পে দর্শন শাস্ত্র ছয় খানি। মীমাংসা দুই, ন্যায় দুই, সাংখ্য দুই। জৈমিনির কর্ম্ম মীমাংসা ও ব্যাসের ব্রহ্মমীমাংসা।

১ 'বিধি' অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বৈদিক উপাসনা বা 'কর্ম্মকাণ্ড'।

২ 'ন্যায়' অর্থাৎ বৈদিক যুক্তি ও তর্কদ্বারা ঈশ্বর-নিরূপণার্থ 'অনুমানকাণ্ড'।

৩ 'যোগ' অর্থাৎ পুরুষ-ব্যাপার রূপ অভ্যাস দ্বারা সূক্ষ্মপ্রাকৃতিক-মহৈশ্বর্য্য ও কৈবল্য লাভার্থ 'সাধন কাণ্ড'।

৪ 'মোক্ষ'অর্থাৎ পুরুষ-ব্যাপার-বিশিষ্ট ক্রিয়া ও উপাসনার অতীত, এবং তর্কানুমানের অবিষয় নির্গুণ-মুক্তি; অথবা সোপাসন পুরুষ-ব্যাপার-সাধ্য সগুণ-মুক্তি; এই উভয় প্রকার মুক্তি প্রতিপাদক 'জ্ঞানকাণ্ড'।

মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের বিচার যাহা পূর্ব্বমীমাংসা নামে প্রসিদ্ধ; অশ্বালায়ন, গোভিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রণীত শ্রৌত, গৃহ্য ও সামায়াচারিক সূত্র-গ্রন্থাবলি যাহা স্মৃতি বা কল্পশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ; মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত প্রভৃতি মুনিগণ প্রণীত সংহিতা সমূহ যাহা স্মৃতি-নিবন্ধ নামে প্রসিদ্ধ; তদ্ভিন্ন জৈমিনি-দর্শনের মাধবাচার্য্যকৃত অধিকরণমালা, কুমারিলভট্ট ও মণ্ডন মিশ্রের বার্ত্তিক গ্রন্থ, পার্থসারথি মিশ্রকৃত শাস্ত্রদীপিকা ও ন্যায়-রত্নমালা, শালীনাথমিশ্রকৃত প্রকরণ-প্রপঞ্চিকা, এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকৃত

---

কর্ম্ম মীমাংসা ক্রিয়া কর্ম্মের দর্শন এবং ব্রহ্মমীমাংসা ব্রহ্মজ্ঞান, মোক্ষ ও ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদক। এই দুই শাস্ত্রে 'কর্ম্ম' আর 'ব্রহ্ম' যথাক্রমে বেদের এই দুইটী অবয়ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌতমের ন্যায় ও কণাদের বৈশেষিক উভয়ই বেদের "ন্যায়" অবয়বের যোগে ঈশ্বর প্রতিপাদক। কপিলের সাংখ্য এবং পতঞ্জলির যোগ উভয়ই পুরুষবুদ্ধির আয়ত্ত 'জ্ঞান' ও 'যোগ' প্রতিপাদক। সাংখ্যজ্ঞান সাংখ্যযোগেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এ উভয়ই বৈদিক সাংখ্যজ্ঞান ও যোগরূপ কর্ম্মের প্রতিপাদক।

মহাসংগ্রহ যাহা নবীনস্মৃতি নামে বিখ্যাত ; এই সমস্ত শাস্ত্র বিধি অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত।

মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় এবং মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক নামক পদার্থবিচার রূপ দর্শন দ্বয় অনুমানকাণ্ডের অন্তর্গত। তদুপকারী বাৎস্যায়ন ভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্রকৃত টীকা, উদয়নাচার্য্যের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী ও বৌদ্ধাধিকার, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ন্যায়চিন্তামণি, পক্ষধরমিশ্রকৃত আলোক, গকুলনাথ উপাধ্যায়কৃত পদবাক্যরত্নাকর, রঘুনাথ শিরোমণিকৃত চিন্তামণি-দীধিতি মথুরানাথকৃত চিন্তামণি-টীকা, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য-কৃত দীধিতির টীকাদ্বয়, গদাধরকৃত চৌষট্টিবাদ—এ সমস্ত গ্রন্থও উক্ত ন্যায় বা অনুমান কাণ্ডের মধ্যগত।

মহর্ষি কপিল প্রণীত ষড়ধ্যায়ীসূত্র ও তত্ত্বসমাসসূত্র নামক সাংখ্যদর্শন, ও মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শন ও মহর্ষিব্যাসকৃত তদ্ভাষ্য এই প্রকৃতি পুরুষ ভেদাত্মিকা বিদ্যা দ্বয় যোগকাণ্ডের মধ্যগত। তদ্ব্যতীত বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত প্রবচন ভাষ্য ও সাংখ্যসার, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যসপ্ততি, বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী, ভোজরাজকৃত রাজবৃত্তি, পঞ্চশিখ্যাচার্য্যের সাংখ্য সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থও যোগকাণ্ডের অন্তর্গত।

মহামুনি ব্যাসদেব প্রণীত উত্তরমীমাংসা যাহা বেদান্তদর্শন নামে প্রসিদ্ধ তাহা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। তাহার শঙ্করাচার্য্য কৃত অদ্বৈত প্রস্থান-রূপ শারীরক ভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত উক্ত ভাষ্যের টীকা, ভারতিতীর্থ কৃত বেদান্তাধিকরণমালা, ভারতিতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকৃত পঞ্চদশী, সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার, রামানুজস্বামিকৃত বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্য, মধ্বাচার্য্যকৃত

দ্বৈতভাষ্য এবং তদ্ভিন্ন ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, উত্তরগীতা, রামগীতা, অষ্টাবক্রসংহিতা, শঙ্করাচার্য্যের কৃত অন্যান্য বহুতর গ্রন্থ ইত্যাদি শাস্ত্র সমূহ জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যগত। শ্রীমদ্ভাগবৎ, অষ্টাদশ পুরাণ, এবং তন্ত্রশাস্ত্রেও ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ সূত্রে ভক্তি ও ক্রিয়াকুসুম সকল গ্রথিত দৃষ্ট হয়।

এই বিধি, ন্যায়, যোগ, মোক্ষ, প্রতিপাদক চারিপ্রকার শাস্ত্র এক মাত্র বৈদিক ধর্ম্মেরই চারি প্রকার প্রস্থান স্বরূপ। একমাত্র বেদেরই মধ্যে কর্ম্মাঙ্গ, ন্যায়াঙ্গ, যোগাঙ্গ ও মোক্ষাঙ্গ রূপ যে সকল শ্রুতি ও প্রস্থান আছে ঐ চারি প্রকার শাস্ত্রে তাহাই বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার এক এক অঙ্গ এক এক প্রকার অধিকারির উপকারী। যাঁহারা এরূপ মনে করেন যে ঐ চারিপ্রকার শাস্ত্র ঋষিদের স্বীয় স্বীয় মত, এবং বেদবিরুদ্ধ, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ নহেন।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

## 'বিধি' অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রভৃতি "কর্ম্মকাণ্ড"।

---

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" (বাজসনেয় শ্রুতি ২) অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করিবেক। "বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচতদ্বিদাং। আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেবচ ॥" (মনু ২।৬) বেদ সমস্ত, স্মৃতি সমস্ত, বেদজ্ঞ ও স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞগণের শীল, সাধুদিগের আচার এবং শাস্ত্রার্থে নিঃসন্দেহ রূপ আত্মতুষ্টি এই সমুদয় ধর্ম্মের প্রমাণ। "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্ম ইতি" (জৈমিনি) ॥ ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে তাহা মানবকে ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করায়। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মের সেই প্রবর্ত্তমান লক্ষণ কর্ত্তৃক সকলেই উত্তেজিত হন।" কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকৃতি জৈর্গুণৈঃ। (গীতা ৩।৫) প্রকৃতির প্রভাবে সকল মনুষ্যই অবশ হইয়া ফলার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

মহর্ষিগণ দেখিলেন জনসমাজে এমন অনেক লোক রহিয়াছেন এবং পরেও থাকিবেন যাঁহারা অনুমান, যোগসাধন এবং জ্ঞান-প্রীতি দ্বারা মস্তিষ্ক সঞ্চালন বা হৃদয়ের কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু কেবল বিধি ও প্রবৃত্তির দাস হইয়া বেদবিহিত সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম, জাতকর্ম্মাদি নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও শ্রৌত স্মার্ত্ত প্রভৃতি কাম্যক্রিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঐহিক সুখ ও পারলৌকিক স্বর্গভোগ *

---

* শাস্ত্রানুসারে স্বর্গভোগ ঐহিক সুখের ন্যায় অনিত্য। কিন্তু মহামায়াস্বরূপিণী স্থূল প্রকৃতি দ্বারা জীবের যথার্থ জ্ঞান আবৃত। তাহাতে জীব প্রকৃতির সুখসাধক প্রবর্ত্তমান লক্ষণকর্ত্তৃক স্বীয় অন্তরেই উত্তেজিত হন। উত্তেজিত হইয়া তদুদ্দেশে কর্ম্ম করেন। ঈশ্বর নানা দেবতা রূপে সেই সকল কর্ম্মে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক যজমানের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। জ্ঞানোদয়ে এরূপ অনিত্য সুখের আকর্ষণ স্বপ্নবৎ মিথ্যা হইয়া যায়।

চান। তাঁহারা দেখিলেন এই প্রকার কর্ম্মীগণের সংখ্যাই অনেক। অতএব তাদৃশ অধিকারীগণ বেদবহির্ভূত দুর্গমপথে অথবা বিধিব্যবস্থা-হীন স্বেচ্ছাচারে ঘূর্ণায়মান না হইয়া যাহাতে কেবল সুনিয়মের বলে ধর্ম্ম ও ভারতীয় শিষ্টাচার রক্ষা করিতে পারেন সেই উদ্দেশে উপরি উক্ত বিধিপর শাস্ত্র সকল প্রচার করিলেন। তাঁহারা কর্ম্মনিষ্পাদক সাক্ষাৎ বেদভাগ হইতে ঋষি, ছন্দ, মন্ত্র, ও দেবতা সকল উদ্ধার পূর্ব্বক বিশিষ্ট বিশিষ্ট গোত্র ও শাখা প্রচলিত ক্রিয়া সমস্ত রক্ষা করিলেন। যে সমস্ত প্রচলিত ক্রিয়ার মূল স্বরূপ সাক্ষাৎ শ্রুতি পাওয়া যায় নাই, তাদৃশ ক্রিয়া সমুহের ধাতু অনুসারে তাহার শাসন-পর শ্রুতিবাক্য সকল অনুমান পূর্ব্বক ক্রিয়াপদ্ধতি ও তদ্বিষয়ক বিচারগ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিলেন।

ফলতঃ ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান, প্রীতি, বা তর্কানুমানের কিছু-মাত্র সাহায্য গ্রহণ না করিয়া এবং প্রার্থনা, স্তোত্র, বন্দনা প্রভৃতি মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ বা অর্থচিন্তা না করিয়া যজ্ঞ বা উপাসনা করা অধিকাংশ লোকেরই প্রকৃতি। জ্ঞান, বিচার, চিন্তা ও ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করা যত কঠিন, বিধি ও নিয়ম রক্ষার নিমিত্তে তাহা করা তত কঠিন নহে। এই জন্য অধি-কাংশ লোক বিধি ও পদ্ধতির অনুগামী। এরূপ না হইলে কোন প্রকার সামাজিক ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারেনা।

একদিকে মানব প্রকৃতির ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সনাতন বৈদিক প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের উত্তরসাধকতা এই দুই তত্ত্বকে রক্ষা করার উদ্দেশে ঋষিগণ প্রাগুক্ত বিধিপর শাস্ত্র সমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন। কেবল পদ্ধতি অনুযায়ী যজ্ঞ ও ঈশ্বরো-পাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান তাহার যত উদ্দেশ্য, ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান

পূর্ব্বক বা প্রীতি পূর্ব্বক তত নহে। জ্ঞান, প্রীতি, চিন্তা, অনুমান, তর্ক, বিচার, এবং হৃদয়ের অনুমোদিত উপাসনা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান যতই কনিষ্ঠ, নিকৃষ্ট, দুর্ব্বল, বা নির্জ্জীব হউক তাহা অস্বাভাবিক বা অশাস্ত্র নহে। কেননা ব্যাসের ও মন্বাদি ঋষিগণের বেদানুগত সিদ্ধান্তমতে অনুষ্ঠাতার অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরেই সে সমস্ত ক্রিয়ার অন্তিম উদ্দেশ্য।

ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিচার ও জ্ঞান ধারণ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতিতেও সকল হৃদয় অভিষিক্ত হয়না। এই জন্য বিধিপর শাস্ত্রানুসারে বৈদিক নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের সামাজিক ধর্ম্ম। সেই সনাতন ধর্ম্মকে উঠাইয়া দিয়া যদি নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান, প্রীতি বা অনুমান চরিতার্থজনক কোন উচ্চ ধর্ম্মকে সাধারণ জনসমাজে প্রতিষ্ঠা কর, তাহা বেদবিহিতই হউক, তন্ত্রবিহিতই হউক, অথবা স্বকপোল-কল্পিতই হউক, কখনই জনসাধারণের অধিকারে সংলগ্ন হইবেনা। বরং তাহা যে অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, তাঁহাদেরই মধ্যে তাহা ক্রমে বিধিপর, পদ্ধতিপর ও নিজ্জীব ভাব ধারণ করিবে। দোষের মধ্যে এই হইবে যে, তখনও সেই নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন ধর্ম্ম উচ্চধর্ম্ম নাম লইয়া কেবল হাস্যাস্পদ হইবে।

এই কারণে ভারতবর্ষে বেদান্তপ্রতিপাদ্য মোক্ষজনক ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা; সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রোক্ত মহৈশ্বর্য্যপ্রদ যোগসাধন ও পরম পুরুষার্থরূপ কৈবল্য-বিচার; এবং ন্যায় ও বৈশেষিক প্রতিপাদ্য অনুমানসিদ্ধ ঈশ্বরের উপাসনা কখনও সামাজিক ধর্ম্ম হয় নাই। কেবল বেদবিহিত

সন্ধ্যাবন্দনা ও যজ্ঞোপাসনাদি কর্ম্মকাণ্ডই ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম। জ্ঞান বা ভক্তির অধিকারে এক মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা উপলক্ষ করিয়া এই ভারতবর্ষে নানকপন্থী, কবিরপন্থী প্রভৃতি যত সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিলেন অবশেষে সকলেই কর্ম্মকাণ্ডে ও স্থূলোপাসনায় পরিণত হইয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বেদ, স্মৃতি, মীমাংসা বিহিত সনাতন কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তে অভিনব কর্ম্মকাণ্ডবিশিষ্ট উপধর্ম্ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও কার্ম্মকাণ্ডই প্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারা আপনাদিগকে এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক বলেন বটে; কিন্তু হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অধিকাংশতঃ পদ্ধতিমাত্রে পরিণত নির্জ্জীব উপাসনায় অবতরণ করিয়াছেন। ভারত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে উহা কর্ম্মকাণ্ড মাত্র। উহার অনুষ্ঠানে তাঁহাদের স্ব স্ব সমাজ রক্ষা হইতে পারে; একেশ্বরের উপাসনা বলিয়া উহা জ্ঞানশূন্য সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিদিগের নিকট আদরণীয় হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল বৈরাগ্যজনক সগুণোপাসনা সিদ্ধ হয়না।

প্রকৃত প্রস্তাবে নির্গুণাধিকারে ব্রহ্মজ্ঞান অথবা সগুণাধিকারে ব্রহ্মোপাসনা, যোগাচার ও ব্রহ্মচর্য্যাদি তপস্যার আচরণ সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারেনা। তাহা কেবল উচ্চ উচ্চ অধিকারী বিশেষের অবলম্বনীয়। এই কারণে ঋষিগণ বেদের অভিপ্রায়ানুসারে সাধারণের হিতকামনায় বেদবিহিত প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ডকে ভারতের সামাজিক ধর্ম্মরূপে রক্ষা করিয়াছেন। উহা যেমন একদিকে সাংসারিক ও স্বর্গাদি ফলদায়ক সেইরূপ

অন্যদিকে উহা ভারতসমাজের বন্ধন। উহারই অনুসরণ দ্বারা ভারতে ব্রাহ্মণত্ব ও হিন্দুত্ব রক্ষা হইয়া থাকে। তাহা অগ্রেপ্রতি পালন করিয়া যাঁহার যেমন প্রবৃত্তি তদনুসারেতিনি যোগী, সগুণ-ব্রহ্মোপাসক বা ভক্ত হইতে পারেন। অথবা উচ্চ-বেদান্ত-বিজ্ঞানানুসারে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারেন।

যদিও ঋষিগণ বেদরূপ দিব্য জ্ঞান-নয়নে জানিতেন যে, বিধি অবলম্বন, বা ফলাকাঙ্ক্ষারূপ প্রবৃত্তির অনুসরণ পূর্ব্বক নানা দেবতাভেদে যে সকল অর্চ্চনার আচরণ হয় তাহার ফল স্বর্গাদি ভোগ মায়াবন্ধন মাত্র; তথাপি সাধারণ জনসমাজের অধিকার-পোষক বেদভাগ দৃষ্টে তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে ফলকামীগণের পক্ষে সেই সমস্ত অর্চ্চনা অবশ্য করণীয়। তাঁহারা ইহাও জানিয়াছিলেন যে, তাদৃশ সোপাসন-কর্ম্ম সকল নানা দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক আচরিত হইলেও একমাত্র ঈশ্বরই নানা দেবতারূপে তৎসমস্তের ফলদাতা। এজন্য তাঁহারা সর্ব্ববেদ মন্থন পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদে যে যে ক্রিয়া ও উপাসনা যে যে দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক করার বিধি আছে, সেই সমস্ত বিধি অনুসারে সেই সেই ক্রিয়া সেই সেইদেবতার নামোল্লেখপূর্ব্বক করাই বিহিত। কেননা একদিকে মানব-প্রকৃতি-গত ভিন্ন ভিন্ন কামনা, অন্যদিকে ভৌতিক প্রকৃতি-গত ভিন্ন ভিন্ন ভোগ্যফল, স্ব স্ব গুণানুসারে ফলদাতা ঈশ্বরেতে নানাপ্রকার রূপ, নাম ও গুণ-কল্পনা করিয়াছে। সুতরাং মায়াময়ী প্রকৃতির অধিকারে ঈশ্বরের রূপ গুণ অপরিহার্য্য। এই জন্য বিধি-বিহিত নাম রূপাদির অবলম্বনে ক্রিয়া ও উপাসনাদি অনুষ্ঠিত হওয়াই কর্ত্তব্য। তাহাই ভারতবর্ষের সনাতন রীতি।

ফলতঃ সামাজিক উপাসনা মাত্রই পদ্ধতিতে পরিণত হইয়া নির্জ্জীব ভাব ধারণ করে। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাই বল অথবা নানা দেবতার অর্চ্চনাই হউক,সাধারণ জনসমাজের পক্ষে সকলেরই সমান ভাব। এই নিমিত্তে ঋষিগণ এখনকার কৃত-বিদ্যস্থির প্রকৃতিগণের ন্যায়,সেই নানা দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞোপাসনা-পদ্ধতিকে জনসমাজ হইতে রহিতও করেন নাই এবং তৎপরিবর্ত্তে ভারতসমাজে একমাত্র ঈশ্বরোপাসনাও প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। যখন সর্ব্বপ্রকার সামাজিক উপাসনাই পদ্ধতি ও বিধির দাসত্ব মাত্র, তখন সমাজ মধ্যে নামে একমাত্র ঈশ্বরেরউপাসনা আচরিত হইলেও তাহার ভাব-শুদ্ধি হইতে পারে না। বাহ্য সূক্ষ্ম ও চাকচিক্য বিশিষ্ট, কিন্তু অভ্যন্তর স্থূল ও মলিন; বাহ্য সভ্যতাযুক্ত ও বিজ্ঞানালোকে উজ্জ্বল, কিন্তু অভ্যন্তর অভব্যতা ও অবিদ্যান্ধকারে আবৃত; বাহ্য পরোপকার ও সমাজসংস্কার রূপ অভিমানে উন্নত, কিন্তু অন্তর স্বার্থপূর্ণ ও অসংস্কৃত; এতাদৃশ প্রকৃতি সকল বর্ত্তমানকালীন উন্নতির উপাদান। এই সকল পাপ সমাজ হইতে বিদূরিত না হইলে নামমাত্র একেশ্বরের উপাসনায় ফল কি। তাদৃশ পাপ সকল সমাজ হইতে একেবারে অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব। কাজে কাজেই ব্রহ্মোপাসক ও যোগীজনসেব্য একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা বা আত্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা কখনই সামাজিক ধর্ম্ম হইবে না।

বিশেষতঃ জনসমাজের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই সদাকাল ফলকামী বা বিধিসেবী। সকলেই ফলকামনারূপ কঠিন হৃদয়-গ্রন্থী দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত। তাদৃশ স্থলে তাঁহাদের পক্ষে নিষ্কাম-প্রকৃতি একেশ্বরোপাসনা বিশুদ্ধ হইবেনা। ইহা জানিয়া ঋষিরা ভারতে ধর্ম্ম-বিপ্লব করেন

নাই। বরং সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডই পরম্পরা ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক জানিয়া তাঁহারা উদার চিত্তে উচ্চ ও নিম্নাধিকারী সমস্ত গৃহাশ্রমীর পক্ষেই সেই বেদবিহিত সনাতন সামাজিক ধর্ম্ম প্রতিপালনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশানুসারে অনুষ্ঠান পরায়ণ হইলে ভারতসমাজের একতা রক্ষা হয়; ঘরে ঘরে বিভিন্নাধিকারীগণ অবিরোধে কালযাপন করিতে পারেন; দেব ও পিতৃক্রিয়া সকল করিতে করিতে স্নান, উপবাস, যুক্তাহার এ যুক্তবিহার দ্বারা শরীর ইন্দ্রিয় ও মন সংযত হইয়া ক্রমে যোগাধিকার জন্মে; নৈবেদ্য, বস্ত্র, রজত, কাঞ্চন, হস্তি, অশ্ব, গাভী প্রভৃতি উৎসর্গ দ্বারা ক্রমে স্বার্থত্যাগরূপ বৈরাগ্যাভ্যস্থ হয়; এবং সঙ্গগুণে সন্তান সন্ততিগণের চরিত্র আস্তিক্য, শৌচ, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, ধর্ম্মপূত-শিষ্টাচার প্রভৃতি শুভ ধাতু দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে যাঁহারা উচ্চাধিকারী তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় না। তাঁহারা ফলকামনা শূন্য, তাঁহাদের আত্মা একমাত্র পরব্রহ্মের জ্ঞানে দীপ্তিমান, তাঁহারা বিষয়-বৈরাগী,অথচ শাস্ত্রের অবিরোধে নিম্নাধিকারীগণের এবং সমগ্র ভারত-সমাজের প্রকৃত কল্যাণ-কামী। সেই মহানুভব সাধুগণ বেদরূপ স্বর্গীয় নয়নে জানেন যে নিম্নাধিকারীরা নানারূপ গুণ ও উপাধি যোগে; সাংসারিক সুখার্থে, স্বর্গসুখ উপভোগার্থে ও পরলোকের মঙ্গলার্থে নানাপ্রকার কামনার যোগে; এবং বিধি, পদ্ধতি ও শাস্ত্রের আশ্রিত হইয়া যে সকল দেব দেবীর পূজা করেন সে দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নহেন। একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্ব দেবতা। অতএব তাঁহারা তাদৃশ উপাধি, ফলকামনা ও পদ্ধতিপর সামাজিক ধর্ম্মে যোগ দিয়াও নির্লিপ্ত

থাকেন। হৃদয়ে ফলসঙ্কল্প বর্জ্জিত এবং একমাত্র পরব্রহ্মেরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তাঁহারা কেবল বাহ্যতঃ লোকশিক্ষার্থ এবং আশ্রম-বিহিত আচার পালনার্থ, অথবা একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বদেবতা এই সমদর্শন জন্য ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মে যোগ দিয়া থাকেন। সেরূপ যোগপূর্ব্বক ও সঙ্গত্যক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করায় তাঁহাদের দ্বৈধভাবরূপ পাপ, কনিষ্ঠাধিকার-স্পর্শরূপ হীনতা, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মরূপ বন্ধন, এবং বেদবিধি ও পদ্ধতির দাসত্ব রূপ আবদ্ধতা উপস্থিত হয়না। তাঁহাদের এই ভাবই ভারত-ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং উপাদেয় ভাব। ঋষি ও আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পদ্ধতিপর ও ফলকামনা বিশিষ্ট সামাজিক ধর্ম্মের বাহ্যসংস্কার কোন কার্য্যেরই নহে। বাসনা-বৈরাগ্য সহকারে পরমাত্ম-ভাবে স্থিতি করাই মুক্ত ও পরিশুদ্ধভাব। তাদৃশ পরমাত্ম-ভাবযুক্ত মহাত্মারা কিঞ্চিৎ অবতরণ পূর্ব্বক সামাজিক ধর্ম্মে যোগ দিলে তাঁহাদের সে ভাবের ক্ষতি হয় না। বরং তাহাতে গৌরব আছে। যতদিন সে ভাব উপার্জ্জিত না হয়, ততদিন সর্ব্বপ্রকার উপাসনাই বন্ধনমাত্র। একেশ্বরের উপাসনাই বল, আর দেব দেবীর পূজাই বল, ততদিন কিছুই সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেনা। এই কারণে, ঋষিগণ পদ্ধতিপ্রিয় ফলকামী জন-সাধারণের অধিকারে কেবল বেদবিহিতসন্ধ্যাবন্দনা, যজ্ঞাদিক্রিয়া ও দেবোপাসনাকে সামাজিক ধর্ম্ম রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপে সামাজিক ধর্ম্ম সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহারা চিন্তা-শীল, ধ্যানশীল, প্রেমভক্তি পরায়ণ এবং জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ অধিকারীর মঙ্গলার্থে বেদবিহিত বিশেষ বিশেষ উন্নত বিদ্যা, সাধন-প্রণালী এবং মোক্ষ বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন।

# তৃতীয় অধ্যায়।

## "ন্যায়" অর্থাৎ বৈদিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরনিরূপণার্থ "অনুমানকাণ্ড।"

"এতচ্ছাস্ত্র প্রয়োজনং চার্ব্বাকাদিমতনিরাকরণপূর্ব্বকং জগৎকারণতয়া ঈশ্বর সংস্থাপনং সংশয়াদিনিরূপণেন বেদার্থ নির্ণয়শ্চ।" (ন্যায়ঃ—শব্দকল্পদ্রুমে) চার্ব্বাকাদি-মত নিরাকরণপূর্ব্বক জগৎকারণ ঈশ্বর সংস্থাপন এবং সংশয়াদির নিরূপণ দ্বারা বেদার্থের নির্ণয় এই শাস্ত্রেরপ্রয়োজন।" আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রহবিরোধিনা। যস্তার্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদনেতরঃ" (মনু ১২।১০৬) যে ব্যক্তি বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে বেদের অবিরোধী তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে ইতরে জানে না।

সকলেই যে নিরবচ্ছিন্ন বেদ বিধির সেবায় বদ্ধ থাকিতে পারে এমন নহে। সকলেই যে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারে এমনও নহে। নানাবিধ সংশয়াদি নিবন্ধন যুক্তি ও চিন্তাশীল অনেক ব্যক্তি তর্কানুমানের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইবার অভিলাষী হন। এমত লোকেরা আপনাদের উন্নতির অধিকার হইতে পতিত না হন; এজন্য গৌতম ও কণাদ বৈদিক পদার্থ-বিচার দ্বারা সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিবার উপায়স্বরূপ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন নামক মহাবিস্তীর্ণ বিদ্যাদ্বয় প্রচার করিলেন। এই উভয়দর্শনে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের বলে নহে, যোগাচার বা ব্রহ্মোপাসনার বলে নহে, কিন্তু কেবল পদার্থ বিচার ও অনুমানের বলে, কেবল বুদ্ধি ও যুক্তির বলে, ঈশ্বর নিরূপণের নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ তর্কানুমান সম্পূর্ণরূপে বেদমূলক। যাঁহাদের

অধিকার তদুপযুক্ত তাঁহারা প্রাগুক্তভারতীয় সনাতন ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া ন্যায় বিহিত তর্কানুমান দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। কিন্তু এমত অভিপ্রায় নহে যে সামাজিক ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায়-বৈশেষিক-বিহিত ঈশ্বরতত্ত্ব বা পদার্থবিচার লইয়া জীবনাতিপাত করিবেন। কোন নৈয়ায়িক কখনও সেপ্রকার করেন নাই। সকলেই কর্ম্মকাণ্ডের মর্য্যাদা রাখিয়াছেন। অধিকন্তু, অধিকারের অপেক্ষাকৃত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অনেকেই বৈদিক নিবৃত্তি-কাণ্ড রূপ বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য মোক্ষধর্ম্মেরও সেবা করিয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মজ্ঞানই ভারতের ধর্ম্ম। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত পদার্থ-বিচার কেবল বিদ্যা মাত্র। তর্কানুমানপ্রিয় নাস্তিক ও চার্ব্বাক প্রভৃতি বাদীগণকে পরাস্ত পূর্ব্বক বেদবিহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মকে রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

## "যোগ" অর্থাৎ সূক্ষ্মপ্রাকৃতিক মহৈশ্বর্য্য ও কৈবল্য লাভার্থ "সাধনকাণ্ড।"

> "ধ্যান ধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ।" (কপিল-সূত্র ৬।২৯) ধ্যান ধারণা অভ্যাস বৈরাগ্যাদি দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধনরূপ অভিমান বাধিত হয়। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (পাতঞ্জল সূত্র ১।১) চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ কহে। সেই নিরোধ সাধন সাপেক্ষ। রজস্তমোগুণদ্বয় নিরুদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণ মাত্র প্রকাশ পাইলে অণিমাদি মহৈশ্বর্য্য-সকল লাভ হয়। ব্রহ্মলোকে গতি হয়। এবং সমস্ত গুণ-ত্রয় নিরুদ্ধ হইলে কর্ম্মবন্ধনরূপ অভিমান বিগত হইয়া কৈবল্যলাভ হয়। "যোগিনঃ প্রতিচস্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে" (বেদান্ত সূত্র ৪।২।২১) সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জ্ঞান-যোগীদিগের শুক্লমার্গে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গতি হয়। কর্ম্ম-যোগীরা কৃষ্ণমার্গে অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। "শিবতুল্যোপি যো যোগী গৃহস্থশ্চ যদাভবেৎ তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ। (তন্ত্রে) গৃহস্থ ব্যক্তি শিবতুল্য যোগী হইলেও বেদোক্ত ও আগ-মোক্ত লৌকিকাচারকে মনেতেও লঙ্ঘন করিবেন না।

কপিল ও পতঞ্জলি দেখিলেন যে এমন অধিকারীও জন-সমাজে অনেক থাকিবেন যাঁহারা শুদ্ধ দাসবৎ বিধির সেবা, কেবল আনুমানিক ঈশ্বরতত্ত্বের বিচার, সাধন নিরপেক্ষ মোক্ষ-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান, অথবা প্রীতি ভক্তি বিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মোপা-সনা মনোনীত করিবেন না; কিন্তু বৈদিক্ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক ও সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা অনুযায়ী যোগাচরণ, এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি তপ-

শ্চরণ দ্বারা যাহাতে আত্মকৈবল্য * বা সূক্ষ্মতম প্রাকৃতিক তত্ত্বস্বরূপ *—হৈরণ্যগর্ভ সম্পৎরূপ সুদীর্ঘস্থায়ী যোগৈশ্বর্য্য লাভ করা যায় তাহাতে রত হইবেন। ইহা বিবেচনা করিয়া উক্ত মহর্ষিদ্বয় মহা পবিত্র সাংখ্যজ্ঞান ও যোগবিদ্যা প্রণয়ন করিলেন। কেবল অভ্যাস, যমনিয়মাদি, এবং ধ্যানধারণা প্রভৃতি সাধনদ্বারা যোগপ্রতিপাদ্য সিদ্ধিলাভ হয়। যোগ-বিদ্যা-নুমোদিত সাধন-পদ্ধতি কর্ম্মকাণ্ডীয় পদ্ধতির ন্যায় নির্জ্জীব নহে। তাহা মহা জীবন্ত। কেননা তদ্দ্বারা সাধক স্বীয় আন্ত-রিক তমোগুণ ও রজোগুণকে দমন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিতি করিতে অভ্যাস করেন এবং তৎফলে ক্রমে অণিমা লঘিমাদি সুসূক্ষ্ম প্রাকৃতিক মহৈশ্বর্য্যসকল লাভ করিয়া থাকেন। অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈবল্য প্রাপ্ত হন। এই সাধন-পদ্ধতি সহকারে যখন সগুণ-ব্রহ্মেতে চিত্তের সমাধি হয়, তখন তাহাকে সবি-কল্প-সমাধি কহে। যখন নির্গুণ-ব্রহ্মতে সমাধি হয় তখন তাহাকে নির্ব্বিকল্প-সমাধি কহে। যোগসহকারে সগুণভাবে ব্রহ্ম-সাধন এক প্রকার সোপাসন-কর্ম্ম। বেদান্ত-বিহিত সগুণ-ব্রহ্মোপাসনার সহিত ইহা সমফল জনক। যোগী ও ব্রহ্মো-পাসক উভয়েরই ব্রহ্মলোকে গতি হয়। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ-গৃহস্থ ইঁহারা যদি সগুণ ব্রহ্মোপা-সক হন, তবে সকলেই ব্রহ্মভুবনরূপ দেবযানের অধিকারী।

---

* সাংখ্যের জ্ঞানোপদেশ বৈদান্তিক জ্ঞানের তুল্য। প্রভেদ এই যে সাংখ্য-জ্ঞান সাধন-সাপেক্ষ, বৈদান্তিক জ্ঞান সাধন-নিরপেক্ষ। নতুবা উভয়েই জ্ঞান শাস্ত্র। যেমন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল স্বর্গাদি, সেইরূপ যোগাচারের ফল ব্রহ্ম-লোক। এই উভয় দৃষ্টিতে কর্ম্ম ও যোগকে ক্রিয়া মাত্র কহা যায়। যে অতি-ক্রান্ত যোগের ফল নির্গুণমোক্ষ তাহা জ্ঞান-ফলের তুল্য।

ফলে যোগাচার পরায়ণ, ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মোপাসক হইলেই যে ভারতীয় কর্ম্মকাণ্ডকে লঙ্ঘন করিবে এমন উক্ত হয় নাই। বরং শাস্ত্রে এমন শাসন আছে যে গৃহস্থ ব্যক্তি যদি শিবতুল্য যোগীও হন তথাপি কর্ম্মকাণ্ডরূপ সামাজিক আচারকে মনেতেও লঙ্ঘন কবিবেন না। যোগী ব্যক্তি যদি সমাজ অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ্য,ও সন্ন্যাস এই ত্রিবিধ আশ্রমের কোন আশ্রম অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও তিনি যে আশ্রম অবলম্বন করিবেন,তাঁহাকে তাহারই আচরণ সকল সাধন পূর্ব্বক স্বতন্ত্ররূপে যোগ সাধন করিতে হইবে। স্বেচ্ছাচার করিতে পারিবেন না। এমত স্থলে,গৃহস্থ হইয়া এক ব্রহ্মোপাসনার ছলে ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা যে কত অবিহিত তাহা বলা যায়না। তবে যিনি পরম পবিত্র বৈরাগ্য সহকারে লোকালয় ও চারিপ্রকার আশ্রমই ত্যাগ করিয়াছেন তিনি যোগীই হউন বা ব্রহ্মজ্ঞানীই হউন তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার আশ্রম বিহিত আচার বা সামাজিকধর্ম্ম ত্যাগ প্রত্যবায়জনক নহে।

এই প্রকারে বিধিবাদী জৈমিনি ও স্মৃতিকারগণ, অনুমানবাদী গৌতম ও কণাদ, সাংখ্য ও যোগবাদী কপিল ও পতঞ্জলি বিভিন্ন প্রকার অধিকারীর প্রবৃত্তি ও রুচী দৃষ্টিতে একমাত্র বেদ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান সূত্রিত করিলেন।

# পঞ্চম অধ্যায়।

---

## "মোক্ষ" অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ-মুক্তি প্রতিপাদক "জ্ঞানকাণ্ড"

---

"এতমানন্দময়মাত্মানমনুবিশ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন হ্রসতে ন বর্দ্ধতে ইত্যাদি" (শ্রুতি) জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাতে প্রবেশ পূর্ব্বক জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন। "নচক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা" (মুণ্ডক) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, বাক্য, তপস্যা বা ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। "জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (ঐ) ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে একনিষ্ঠ ব্যক্তি সেই নির্গুণ পরমাত্মাকে জানিতে পারেন। এইরূপ নির্গুণ ভাব ধারণ কঠিন বিধায় নির্গুণ ব্রহ্মতে গুণোপসংহারদ্বারা সগুণোপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে যথা "আত্মেবোপাসিত" (শ্রু) পরমাত্মার উপাসনা করিবে। "আত্মানং চিন্তয়েৎ ভূতিকামঃ" (শ্রু) ঐশ্বর্য্যকামী আত্মোপাসনা করিবেক। "অতশ্চায়নেপি দক্ষিণে" (শাঃ সূঃ ৪।২।২০) সগুণব্রহ্মোপাসকের দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তই সগুণমুক্তি।

মহর্ষি ব্যাসদেব স্বীয় বেদ-বিচার-রূপ শারীরকাখ্য বেদান্ত-দর্শনে নির্গুণ ও সগুণ এই দুইপ্রকার অধিকারীর মঙ্গলার্থে নির্গুণ ও সগুণ উভয় প্রকার শ্রুতিরই বিচার করিয়াছেন। তাহাতে নিরুপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান ও সোপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ই বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই উভয় প্রকার জ্ঞানকাণ্ডেরই নাম নিবৃত্তি ধর্ম্ম। তাহা অকিঞ্চিৎকর কাম্যকর্ম্মরূপ বা বিধিপালনরূপ ধর্ম্ম নহে। পদার্থবিচার বা আনুমানিক ঈশ্বর-সাধনরূপ বিদ্যাও নহে। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকরূপ পুরু-

স্বার্থ-সাধন-পর যোগাচারও নহে। তাহা একমাত্র ব্রহ্মপর। ব্রহ্মলাভই তাহার প্রয়োজন।

ব্রহ্মলাভের পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের ব্যাকুলতা হয় বটে। কিন্তু কেহ কোন মতে তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেনা। কোন সাধনা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা। তিনি স্বয়ম্প্রকাশ। জীবগণ যেমন প্রদীপের আলোক, তর্কানুমান বা কোন প্রকার ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা সূর্য্যদেবকে প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু সূর্য্যদেবই যেমন জীবগণের তাদৃশ সাধন নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হন; তাহাতে যাহাদের চক্ষু প্রকৃতিস্থ আছে তাহারা স্ব স্ব আতত নেত্রে তাঁহার দর্শন লাভ করে; তদ্রূপ, মানবগণ বেদ বিধির সেবা, তর্কানুমানের আশ্রয় বা কোন প্রকার সাধন দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারেন না, কেননা, সেই পরম দেব তাঁহাদের তাদৃশ সাধন-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং প্রকাশ আছেনই; যাঁহাদের জীবাত্মা দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ক্ষুদ্র-জীবানন্দ প্রভৃতি তমোময় আবরণ হইতে শোধিত হইয়াছে তাঁহারাই স্ব স্ব বিকশিত আত্মাতে সেই সবিতৃপ্রকাশবৎ স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন। যে সমস্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুর আত্মা তাদৃশরূপে অনাবৃত ও বিশুদ্ধ হয় নাই, তাঁহারা সেই পরমাত্মাকে স্ব স্ব প্রকৃতি-নিবন্ধন সগুণভাবে, পরোক্ষজ্ঞানে, তটস্থলক্ষণে, উপাধিযোগে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই উভয় প্রকার ব্রহ্মভাবই বেদসম্মত। অতঃপর নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ও সগুণ ব্রহ্মোপাসক হইলেই যে সামাজিক কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিতে হইবে এমন উক্ত হয় নাই। তাদৃশ জ্ঞানী ও উপাসকগণ নিষ্কামভাবে, লোকশিক্ষার্থে ও ব্রহ্মার্পিতরূপে তাহা পালন করিবেন, ইহাই আদেশ।

অতএব নিবৃত্তি-রূপ বৈদিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম-প্রধান। ক্রিয়া-ফল, যুক্তি-ফল বা যোগ-ফল তাহার উদ্দেশ্য নহে। একমাত্র ব্রহ্মই তাহার উদ্দেশ্য। অতঃপর অধিকারী অনুসারে তাহা ত্রিবিধ আকারে বিভক্ত।

(১) নিরুপাধিক বা নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞান।

(২) সোপাধিক বা সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান, অথবা জ্ঞান প্রীতি সহকৃত সগুণভাবে ও তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মোপাসনা।

(৩) লোক শিক্ষার্থে এবং নিষ্কাম ও ব্রহ্মার্পিতভাবে সামাজিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান।

এই ত্রিবিধ অবয়বের মধ্যে আদ্য ও দ্বিতীয় স্বতন্ত্র। তৃতীয়টী তদুভয়ের অন্যতরাশ্রিত। এইক্ষণে ক্রমে উক্ত প্রত্যেক অবয়বের বিস্তার করাযাইতেছে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, যে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইবে তাহা একমাত্র বৈদিক্-সিদ্ধান্তেরই অনুগত। স্বকপোল-কল্পিত নহে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## নিরুপাধিক বা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান।

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্য নিরঞ্জনং" (শ্র) পরমাত্মা নিরংশ, নিষ্ক্রিয়, প্রিয়াপ্রিয়শূন্য, নির্দ্দোষ এবং নির্ম্মল। "ক্রিয়াহীনমনাকারং নিগুণং সর্ব্বগং মহঃ"। (ব্রঃ সঙ্গীত) তিনি ক্রিয়াহীন,আকারহীন, নির্গুণ ও সর্ব্বগত। "প্রপঞ্চোপসমং" (মাণ্ডুক্য) তিনি প্রপঞ্চময় উপাধির অতীত। "উপাধিত্রিতয়াদন্য মাত্মানমবধারয়েৎ" (আত্মানাত্মবিবেক) আত্মাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীররূপ উপাধিত্রয় হইতে ভিন্ন বলিয়া অবধারণ করিবেক। "অশরীরং বাবশন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়েস্পৃশতঃ (শ্র) ইহা নিশ্চিৎ জানিও যে যিনি অশরীরী নিস্তরঙ্গ পরমাত্মা তিনি প্রিয় ও অপ্রিয়, তুষ্টি ও রুষ্টি কর্ত্তৃক স্পর্শিত হন না। "যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা (ছাঃ) যাঁহাকে কেহ দেখিতে শুনিতে ও জানিতে পারেনা তিনি ব্রহ্ম। তিনি 'ভূমা' সর্ব্বব্যাপি অপরিচ্ছিন্ন। "যোবৈভূমাতদমৃতং" (ঐ) যিনি সেই ভূমা তিনি অবিনাশী। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" (তলবকার) তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। "যস্যামতং তস্যমতং মতংযস্য নবেদসঃ" যে ব্রহ্মজ্ঞানির এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারিনাই তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন। যে ব্যক্তির এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি তাঁহাকে জানিয়াছি সে তাঁহাকে জানে না। "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। মনের সহিত বাক্য তাঁহার নিরূপণে অক্ষম।

শাস্ত্রানুসারে আত্মা নিরুপাধিক ও নির্গুণ। স্থূলদেহ রক্ত মাংস অস্থিতে বিনির্ম্মিত এবং ক্ষণভঙ্গুর। সেই স্থূলদেহ বাহ্যতঃ স্থূলপদার্থের বিকার হইলেও তাহার সূক্ষ্ম ও আধ্যা-

ত্মিক তেজোময় এক প্রকার বীজ, মূল, আধার, বা আশ্রয় আছে। সেই বীজের সহিত স্থূলদেহ অবস্থিতি করে। এক দেহ পতনের পর সেই সূক্ষ্ম বীজ বা মূল হইতে পিতৃ ও মাতৃ ধাতু যোগে আর এক স্থূল-দেহ নিষ্পন্ন হয় এবং তাহা যত দিন জীবিত থাকে সেই সূক্ষ্ম-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রাণ, মনঃ সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি এই ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক অবয়ব-সমষ্টিই সেই বীজ। তাহারই নাম সূক্ষ্ম-দেহ। বার বারের স্থূল দেহ বারে বারে বিনষ্ট হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম-দেহরূপ বীজের বিনাশ হয় না। তাহা প্রত্যেক স্থূল-দেহ পতনের পর সংসার-ভোগ-বাসনা-যুক্ত, দেহাভিমানী অমুক্ত জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে বা অন্যলোকে গমন পূর্ব্বক সেই দেহাভিমানী আত্মার নিমিত্তে তথাকার যোগ্য নবীন স্থূল-দেহ উৎপন্ন ও ধারণ করে।

সেই সূক্ষ্ম-দেহ আধ্যাত্মিক ও তৈজসপদার্থ হইলেও তাহা স্বয়ংসিদ্ধ নহে। তাহারও আবার কারণ, বীজ, মূল, আশ্রয় ও আধারস্থান আছে। প্রকৃতিই সেই বীজ। সেই জন্য প্রকৃতিই কারণ-শরীর বা বীজ-দেহ শব্দের বাচ্য। সেই প্রকৃতিই জীবের অনাদিবাসনা, অদৃষ্ট, অবিদ্যা, অজ্ঞান, ও মায়া-মোহ স্বরূপিণী। যেমন স্থূল-দেহ সূক্ষ্ম-দেহকে আশ্রয়-পূর্ব্বক প্রকাশ পায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম-দেহ কারণ-শরীরকে আশ্রয়-পূর্ব্বক স্থূল-দেহ ধারণ করে। এই ত্রিবিধ দেহ-রাজ্যের মধ্যে কারণ-দেহটী সুষুপ্তি, প্রলয় ও আনন্দ-প্রচুর রূপী অব্যক্ত ও বীজ-প্রান্ত। সূক্ষ্ম-দেহটী স্বপ্ন-দেহ-প্রয়োজক, সৃষ্টির অঙ্কুর-সাধক, মানস-রাজ্যরূপী সন্ধি। স্থূল-দেহটী জাগ্রতাবস্থা, সৃষ্টির ব্যক্তাবস্থা, স্থূল-ভোগাবস্থা রূপী বীজযুক্ত-ফল-প্রান্ত। অগ্নি

জীবের মোক্ষ না হয়, তবে, সেই অব্যক্ত প্রান্ত হইতে সুব্যক্ত প্রান্তে এবং সুব্যক্ত প্রান্ত হইতে পুনঃ অব্যক্ত প্রান্তে বারম্বার সংসরণ হইয়া থাকে। নানা প্রকার সুখ দুঃখময় লোক লোকান্তর সকল এবং প্রলয় ও সৃষ্টির ক্রম প্রবাহ সেই উভয় প্রান্তের অধিকার-ভূত। জীবের তদধিকারান্তর্গত দেহাভিমান-নিবন্ধন যে সংসৃতি তাহা অনাদি অনন্তকালব্যাপী। জীবাত্মার দেহাভিমানের সেই অনাদি অনন্তকাল ব্যাপী যে প্রবাহ তাহারই নাম সংসারাবস্থা। দেহ ভিন্ন আমি থাকিতে পারিনা, আর সর্ব্বদা দেহ, উপাধি এবং দৈহিক ব্যাপারের ধ্যান, এবং দেহ ভিন্ন সম্ভোগ হয়না এমন ভোগ্য-পদার্থের প্রার্থনা; জীবাত্মার এই সমস্ত প্রকার বিজাতীয় অভিনিবেশ যত কাল থাকে ততকাল সংসার। আর ঐ সকল দেহাদি পদার্থের কিছুই আমার মুখ্যস্বরূপ নহে—কিছুই আমার পরম-প্রেমাস্পদ আনন্দস্বরূপ নহে—কেবল একমাত্র নিত্য পরমাত্মাই আমার মুখ্যস্বরূপ এবং অন্তরাত্মা—তিনিই আমার আনন্দ স্বরূপ; জীবাত্মাতে যখন এইরূপ একাত্ম-ভাবযুক্ত পরমাত্মীয় অভিনিবেশ উদিত হয় তখনই নির্গুণ মোক্ষ। তখন তাদৃশ জীবাত্মার সম্বন্ধে মায়াময়ী মমতার ও মিথ্যা অভিমানের সম্পাদ্য আরোপিত গুণ সকল নষ্ট হয়। সেই সম্পাদ্য গুণস্বরূপ ঐ ত্রিবিধ দেহাভিমান বিগত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে গুণবতী প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকারস্বরূপ বাসনা, কর্ম্মফল, অদৃষ্ট, অবিদ্যা ও মায়ামমতা রহিত হয়। দেহ ও সংসার-যাত্রার অনুকূল পার্থিব বর্ণাশ্রমাভিমান, বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান, ধনজনের অভিমান এবং ঐহিক পারলৌকিক ভোগৈশ্বর্য্যও তাহার অনুসরণ করে।

জীবাত্মার এই শেষোক্ত মোক্ষভাব বা ব্রহ্মাত্ম-ভাবের নাম "নিরুপাধিক বা নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞান"। এই ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মরূপ পরমবস্তুতন্ত্র প্রত্যক্ষজ্ঞান মাত্র। ইহাই মুখ্যজ্ঞান। ইহাতে মলিন ও অকিঞ্চিৎকর কোন মানসিক গুণ বা বাহ্যপ্রকৃতিজন্যপাদ্য কোন ভৌতিক গুণ মিশ্রিত নাই। যদি কেহ তাদৃশ কোন গুণ মিশ্রিত করেন তবে তাহা সগুণ হইবে। এবং তৎসম্বন্ধাধীন ব্রহ্মকেও সগুণ কহা যাইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবাত্মাও সগুণ নহেন, ব্রহ্মও সগুণ নহেন, ব্রহ্মজ্ঞানও সগুণ নহে। গুণ সকল মধ্যপথবর্ত্তিনী প্রকৃতি হইতে দেহাভিমানীও ভোগাভিমানী জীবাত্মা কর্ত্তৃক আপনাতে ও ব্রহ্মেতে আরোপিত হয় মাত্র। তাহাই জীবাত্মার অজ্ঞান-আবরণ। ব্রহ্মরূপ সেই পরমবস্তুর প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ হইলেই ঐ অজ্ঞানাবরণ নষ্ট হইয়া যায়। গুরুকর্ত্তৃক বেদান্তরূপ জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা জীবাত্মার হৃদয়-নেত্র উন্মিলিত হইলেই সেই পরম বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানকেই নিরুপাধিক বা নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান কহে।

উপনিষৎ ও মন্ত্রবর্ণে এইরূপ নিরুপাধিক বা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক বিস্তর শ্রুতি আছে। স্মৃতি, পুরাণ, ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ট, শারীরকসূত্র, বেদান্তাধিকরণমালা, পঞ্চদশী প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্রে সেই সকল শ্রুতির অভিপ্রায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য স্বীয় উপনিষদ্ ভাষ্যে, শারীরকভাষ্যে, গীতাভাষ্যে এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থে শতমুখে সেই সমস্ত শ্রুতির মর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে তৎসমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নির্গুণ-শ্রুতিরই প্রধানত্ব। শারীরকে

ব্যাসদেব লিখিয়াছেন 'অরূপবদেবহি তৎ প্রধানত্বাৎ' (৩।২।১৪) ব্রহ্মের কোনরূপ আকার নাই, কেননা সমস্ত শ্রুতিই তাঁহার নির্গুণত্বকে প্রধান কহিয়াছেন। সগুণ শ্রুতি কেবল উপাধিঘটিত ব্রহ্মশক্তির বর্ণনার্থ। নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মেতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাদি কোন প্রকার রূপ নাই। তিনি যেমন স্থূলশরীর বিহীন, সেইরূপ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মিলিত সূক্ষ্মশরীর বিহীন। তিনি প্রকৃতিদ্বারা বদ্ধ নহেন। অতএব তাঁহার প্রকৃতি-বন্ধন রূপ কোন কারণ-দেহও নাই। সর্ব্বপ্রকার দেহশূন্য সেই পরমাত্মার প্রতিমা বা উপমা নাই। "নতস্য প্রতিমা অস্তি।" (শ্বেতঃ ৪।১৯) এই শ্রুতির ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন "তস্যেশ্বরস্য * * * 'প্রতিমা' উপমা নাস্তি"। এই জগতে তাঁহার তুলনা নাই। কেননা জগতের সমগ্র পদার্থই প্রাকৃতিক গুণ-সম্পন্ন। প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা অন্তর-বাহ্য-আবদ্ধ মানব সেই নির্গুণ ও অরূপী পরমাত্মাকে ধারণ করিতে পারেন না। সুতরাং স্বরূপতঃ ও অপরোক্ষভাবে সেই নির্গুণ পরমাত্মারউপাসনা অসম্ভব। উপাসনা মানবকৃত কর্তৃতন্ত্র-সাধন মাত্র। তাহা দ্বারা মানব কর্ত্তৃক সেই পরমাত্মাতে কেবল মানসিক ও বাহ্যপ্রকৃতির গুণ সকল আরোপিত হয় মাত্র। রজ্জুতে যেমন মানসিক সর্প আরোপিত হয় তদ্বৎ। ফলতঃ রজ্জু যেমন সর্প নহে, উপাস্য ব্রহ্ম সেইরূপ স্বরূপত ভূমা ব্রহ্ম নহেন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। "নেদং যদিদমুপাসতে"। (তলবকার ৪ শ্রু) এই শ্রুতির ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন "ন ইদং ব্রহ্ম যদ্ ইদং উপাধিভেদবিশিষ্টং উপাসতে" যাঁহাকে লোক সকল উপাধিভেদবিশিষ্ট করিয়া উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন। ব্রহ্মেতে স্থূল-দেহ অথবা প্রেম, দয়া, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, আনন্দ

প্রভৃতি মানস-প্রকৃতি সমূহের যে আরোপ তাহারই নাম উপাধি। তাঁহাতে প্রথমোক্ত স্থূল-দেহের আরোপ যেমন স্থূল-উপাধি,সেইরূপ ঐ শেষোক্ত প্রকার সূক্ষ্ম-দেহের আরোপ ও সূক্ষ্মউপাধি। উভয়ই দেহ। কিন্তু তাঁহার কোনরূপ দেহ নাই। সুতরাং সে উভয় আরোপই মিথ্যা। ফলে ঐ দুই দেহের কোনটীর বা উভয়েরই আরোপ ব্যতীত উপাসনা সম্ভবে না। কাজেই উপাস্যরূপে তাঁহার যে ভাবটী চিত্রিত হয় তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ ও স্বরূপ-ভাব নহে। স্বরূপ-ভাব নহে বলিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে উপাস্য ব্রহ্ম ব্রহ্ম নহেন। শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে(১।১।৪)ঐ শ্রুতির উপ.র অধিকতর আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন "উপাস্তিক্রিয়াকর্ম্মত্ব প্রতিশেধোপিভবতি" উক্ত শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেতে উপাসনা ক্রিয়ার কর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।" অর্থাৎ উপাসনা একটি ক্রিয়া মাত্র। সেই ক্রিয়াতে উপাসক কর্তৃপদে স্থিত। এই কর্ত্তা ও ক্রিয়া একটী কর্ম্মপদের আকাঙ্ক্ষা রাখে। যাঁহাকে উপাসনা করা যায় তিনিই কর্ম্মপদ। কিন্তু উক্ত "নেদংযদিদমুপাসতে" শ্রুতি কহিতেছেন যে যাঁহাকে লোকে উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন। লোক সকল উপাস্যরূপে ব্রহ্মের যে ভাবটী চিত্রিত করে তাহা আরোপিত ও মিথ্যা। তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম কোনরূপ প্রতিমা ও উপমা নাই। সুতরাং ভূমা ও নির্গুণ-স্বরূপ, স্বয়ম্প্রকাশ ও সত্যস্বরূপ যে পরব্রহ্ম তিনি কথনও উপাসনার কর্ম্মপদ ও সাধনার প্রকাশ্য নহেন। কেবল মানসধাতু বিরচিত বা বাহ্যপ্রকৃতি দ্বারা কল্পিত তাঁহার যে আধ্যাত্মিক বা স্থূল প্রতিমা তাহাই মানব-কর্ত্তৃক সামান্যতঃ উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে সেই ভাবটী অপর-ব্রহ্মরূপে('অপর'=অপ্রধান)কথিত হয়

সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ পরব্রহ্ম কেবল আত্মজ্ঞানসিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ মাত্র। নরের উপাসনাকাণ্ড তাঁহাকে চিত্র বা প্রকাশ করিতে অক্ষম। প্রদীপদ্বারা যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করা যায়না; উপাসনা, ভক্তি, প্রীতি, যোগাচার, তপস্যা, বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা সেইরূপ তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না।

কিন্তু আদরবতী শ্রুতি পুনশ্চ কহিতেছেন। "তপাংসি সর্ব্বানিচ যদ্বদন্তি" সমস্ত প্রকার তপস্যা তাঁহাকে কহে। অর্থাৎ কল্পিত হইলেও সকল উপাসনাই পরব্রহ্মের উদ্দেশে। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ,প্রস্তর,ধাতু প্রভৃতি নির্ম্মিত প্রতিমা উপলক্ষিত উপাসনাই হউক, আর মানস-ধাতু বিরচিত সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বা ভাব অবলম্বিত উপাসনাই হউক সর্ব্বপ্রকার অর্চ্চনাই তাঁহার উদ্দেশে। সাধক ভক্তির গুণে সকল উপাসনাতেই তাঁহাকে আবির্ভূত দেখেন। ক্রমে চিত্তস্থির ও চিত্তশুদ্ধি করার নিমিত্তে সকলেরই পক্ষে সেই কল্পিত অপরব্রহ্মের অবলম্বনে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। চিত্তশুদ্ধি হইলে নিরুপাধিক পরব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তখন,যেমন সূর্য্যের মহাজ্যোতির মধ্যে সর্ব্ব প্রকার দীপ-জ্যোতিঃ অভিভূত হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানজ্যোতির মধ্যে সূক্ষ্ম উপাধি অবলম্বিত ব্রহ্মোপাসনা ও স্থূল প্রতিমা অবলম্বিত দেবোপাসনা সমানে পরাভূত হইয়া থাকে।

ফলে এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা নির্লিপ্ত ভাবে জনকাদি ঋষির ন্যায় স্ব স্ব সমাজ ও আশ্রম বিহিত ক্রিয়া ও আচার-পরায়ণ থাকিতে পারেন। অথবা সমাজ ত্যাগ ও সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসে সুপারগ হইলে, সর্ব্ব প্রকার আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুকভরতাদির ন্যায় অনা-শ্রমী হইতেও পারেন। তাহার কিছুতেই দোষ হয় না।

বৈদিকধর্ম্মীয় ব্রহ্মণ্য ভাবের উপদেশক মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় শাস্ত্রানুসারে ঐ নির্গুণভাবকে যথোচিত সম্মান দিয়াছেন। নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানকে পরমাদরে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তিনি যথোপযুক্ত অধিকারীদিগের অন্তিম মহোন্নতি নিমিত্তে সোপানস্বরূপে তটস্থ-লক্ষণ যুক্ত এবং বাহ্য-প্রতিমা বিরহিত পরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে ঐরূপ পরোক্ষ ও সগুণ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ও নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদক শাস্ত্র সকল পাঠ দ্বারা উপাসকদিগের চিত্ত ক্রমে অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে। তখন তাঁহারা আপনারাই সাক্ষাৎ মোক্ষ-প্রদ উচ্চবেদান্ত-বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ করিবেন। যে নির্ব্বাণ-মোক্ষপ্রদ পরিপূর্ণ ব্রহ্মাত্ম-ভাব লাভ হইলে সর্ব্বপ্রকার উপাধি, উপাসনা, নাম, রূপ, ফলকামনা নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া অন্তকালে জীবাত্মা পরব্রহ্মে মগ্ন হয়েন, যাহাতে ঐরূপ উচ্চাধিকারীগণ ক্রমে তাদৃশ নিবৃত্তি মার্গরূপ সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তৎপক্ষে উক্ত মহাত্মার বিশেষ যত্ন ছিল। সে বিষয়ে তিনি বিস্তর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নির্গুণে আদর্শ স্থির রাখিয়া সগুণের যোগে আরোহণ করা অথবা উপাস্য-ব্রহ্মেতে 'অস্থূল ও অনণু' প্রভৃতি নির্গুণোপসংহার পূর্ব্বক ক্রমে পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ জ্ঞানের আবৃত্তি করা ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। উক্ত মহাত্মা সেই সিদ্ধান্তকে মর্য্যাদা দিতে ত্রুটী করেন নাই। কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি তাঁহার শাস্ত্র বিচার সম্বন্ধীয় গ্রন্থসকল ও তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকখানি পাঠ করেন তবে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইদানিন্তন অস্থির প্রকৃতিগণ তাঁহার প্রকাশিত শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সকল গ্রহণে সম্পূর্ণ অনধিকারী।

# সপ্তম অধ্যায় !

## সগুণব্রহ্মজ্ঞান ও জ্ঞানপ্রীতি সহকৃত সগুণভাবে ও তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মোপাসনা।

'আত্মেত্যেবোপাসিত।' ( বৃঃ শ্রু ) পরমাত্মার উপাসনা করিবেক। 'আত্মানমেব লোকমুপাসিত। ( ঐ ) পরমাত্মাকেই উপাসনা করিবেক। 'উপাস্যং পরমংব্রহ্ম যত্তৎ শব্দোপলক্ষিতং' (গোবিন্দাচার্য্যের কারিকা) 'যতোবা' ও 'তদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদি তটস্থ লক্ষণ জ্ঞাপক শব্দ সকল উপলক্ষিত ব্রহ্মোপাসনা করিবেক। "জন্মাদ্যস্যযতঃ" ( শাঃ সূ ১।১।২ ) এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ রূপ তটস্থলক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের নিশ্চয় হয়। কিন্তু 'যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ( শ্রু ) বাক্য ও মন তাঁহাকে স্বরূপ লক্ষণে লাভ করিতে অপারগ। 'পরেণচ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ'। পরমেশ্বরে প্রীতি ও সেই প্রীতির অনুকূল অনুষ্ঠানই মুখ্য উপাসনা। 'একাত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ।' ( শাঃ সূঃ ৩।৩ ) জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা মুখ্য প্রিয়। অতএব অতি স্নেহ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবেক। 'অঙ্গেষু যথাশ্রয়ং ভাবঃ ( ঐ ) বিরাটপুরুষের অঙ্গরূপে সূর্য্যাদির উপাসনা করিবেক। ব্রহ্মবুদ্ধিবিনা স্বতন্ত্ররূপে করিবে না। 'ধ্যানাচ্চ' ( শাঃ সূঃ ৪।১।৮ ) ধ্যানের দ্বারা উপাসনা করিবে।"সর্ব্ববেদান্ত প্রত্যয়ঞ্চোদনাদ্য বিশেষাৎ' ( ঐ ৩।৩।১ ) সকল উপাসনাই ব্রহ্মের উদ্দেশে। 'বিকারবর্জ্জিচ তথা হি স্থিতিমাহ'। ( ঐ ৪।৪।১৯ ) ব্রহ্ম নির্গুণ ও সৃষ্ট্যাদি বিকারে নির্লিপ্ত। অথচ উপাসকের কার্য্যার্থ তিনি সগুণ কি না সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ বিশিষ্টরূপে কল্পিত ও গৃহীত হন"কর্ত্তৃতন্ত্রমুপাসনং"(পঃদঃ) উপাসনা কেবল উপাসকের মানস ব্যাপার মাত্র।

উপরে সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণভাবে ব্রহ্মোপাসনা সাধনের যে কএকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল তাহার দ্বারা বুঝা যাইবে

যে ব্রহ্মোপাসনা শাস্ত্রসিদ্ধ। ফলে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রতিমার উপাসনা অপেক্ষা তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও উপাসকের মানসব্যাপার সংযোগাধীন তাহা সূক্ষ্মতম সাকার উপাসনা মাত্র। উপাসনা মাত্রেই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাদি কোন না কোন প্রকার আকার অবলম্বিত। উপাসনা মাত্রেই সগুণ। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনাও ব্রহ্মকে সাকার ও সগুণ-ভাবে চিত্রিত করে। কর্ম্মকাণ্ডীয় সাধনের ন্যায় তাহা বিধিজন্য না হইলেও তাহা অকৃত নহে। তাহা উপাসকেরই কৃত এবং উপাসকরূপ কর্ত্তার অধীন। তাহা উপাসকের বহিঃসাধন না হইলেও অন্তরের সাধন সাপেক্ষ। সেই সাধন ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে চাহে, ব্রহ্মকে সাধকের মনের মতন করিয়া রচনা করে, সংক্ষেপতঃ ব্রহ্ম যাহা নহেন তাঁহাকে তাহা করে। এইরূপ অন্তরের সাধন,প্রতিমা-উপলক্ষিত দেব দেবীর পূজা অপেক্ষা যতই সূক্ষ্ম ও নিরাকার-নিষ্ঠ কেন হউক না, কিন্তু তাহা উপাসকরূপ কর্ত্তার স্বীয় মনের ও মানস-ব্যাপারের অনুগত, কল্পিত ও আরোপিত। এই হেতু শাস্ত্রে তাহাকে কর্ত্তৃতন্ত্র কহেন। তাহা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান নহে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কর্ত্তৃতন্ত্র, বিধিতন্ত্র, বা সাধনপরতন্ত্র নহে। সূর্য্যের প্রকাশ সাধনপরতন্ত্র, কর্ত্তৃতন্ত্র বা বিধিপরতন্ত্র নহে। কিন্তু সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টির অন্ধকার দূর করেন। ব্রহ্মও সেইরূপ স্বয়ম্প্রকাশ হইয়া বাহ্যজগৎ ও অন্তঃকরণাদি সর্ব্ব পদার্থকে অস্তি ভাতি রূপে প্রকাশ করিতেছেন। বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা যখন জীবাত্মার হৃদয়নেত্রে সেই স্বয়ংসিদ্ধ প্রকাশ দৃষ্ট হয় তখনই ব্রহ্মজ্ঞান। সে জ্ঞান ব্রহ্ম হইতেই আগত হয়। তাহা ব্রহ্মরূপ পরমবস্তুর অনুগত, এজন্য

তাহাকে বস্তুতন্ত্রজ্ঞান বলে। উপাসক তাহাকে সৃষ্টি করিতে পারেন না। উপাসকের অন্তঃকরণ বৃত্তি সে জ্ঞানের স্বরূপ চিত্রিত করিতে অক্ষম। সুতরাং উপাসকের কৃত উপাসনা যতই উৎকৃষ্ট, সূক্ষ্ম, নিরাকার, উন্নত ও চিত্তশুদ্ধিজনক হউক, কিন্তু তাহা সাকার ভিন্ন নিরাকার নহে, কল্পনা ভিন্ন সত্য নহে, সগুণ ভিন্ন নির্গুণ নহে এবং সোপাধিক ভিন্ন নিরুপাধিক নহে।

তবে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বিধি ও পদ্ধতি-পর কর্ম্মকাণ্ডরূপ সগুণোপাসনা অপেক্ষা সগুণভাবে অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্মেতে গুণোপসংহার পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ। উপনিষৎ, মনু, শারীরকসূত্র, ভগবদ্গীতা, পঞ্চদশী প্রভৃতি শাস্ত্রে তাহার শ্রেষ্ঠতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞানের অন্তরঙ্গসাধন বলিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। শারীরকে আছে (৩।৩।৫৮)ভূমক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি" সকল কর্ম্মের মধ্যে যেমন যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ সেইরূপ সকল উপাসনার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ। ফলে তাহা যে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি-ধর্ম্ম এমন উক্ত হয় নাই। তাহাতে অতি সূক্ষ্মভাবে উপাধি, নাম, রূপ, নির্দ্দেশ, প্রবৃত্তি ও প্রকৃ-তির সংশ্রব আছে। সুসূক্ষ্মদর্শী ভারত-শাস্ত্রের এই উপদেশ। ইওরোপীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্মপুস্তক, তথাকার দর্শনশাস্ত্র, সুফী-বিদ্যা, প্রেমতত্ত্ব ও যুক্তিশাস্ত্র সকল সে সনাতন সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সমূহ ধারণ করিতে অপারগ। সেই সকল শাস্ত্রাদি যেরূপ উপাসনাকে নিরাকার বলেন এবং ইদানিন্তন ইওরোপীয় বুদ্ধি-সম্পন্ন নব্যসম্প্রদায় যেরূপ ব্রহ্মোপাসনাকে নিরাকারের উপাসনা বলিতেছেন, তাহার ধাতুকে আর্য্যশাস্ত্র-রূপ নিকষো-

ফলে পরীক্ষা করিলে তাহাকে সাকারোপাসনা বলিয়াই স্থিরীকৃত হইবে। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষীয় সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ভারতীয় কর্ম্মকাণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহার শ্রেষ্ঠতার হেতু এই যে, তাহা অন্ধবিধি, নিজ্জীবপদ্ধতি ও কৃচ্ছ্রসাধন মাত্র নহে। তাহা প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি আন্তরিক আলোক-শোভিত ও শুভানুষ্ঠান যুক্ত। ফলতঃ বিধিমাত্র পালন রূপ বাহ্যকার্য্য ও স্থূলাবয়ব অবলম্বিত উপাসনা হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রেম, ভক্তি বিশিষ্ট আন্তরিক উপাসনা ও সাধন যে শ্রেষ্ঠ ও বিবেক বৈরাগ্যের অনুকূল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আর্য্যশাস্ত্র আমাদের পরম কল্যাণকামী। নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞান ও স্বরূপতঃ ব্রহ্মাত্ম-ভাব ধারণ করিতে পারে এমন অধিকারী দুর্লভ। এজন্য শাস্ত্রে নিবৃত্তির প্রার্থী অথচ সগুণ-হৃদয় ও শুভ উদ্দেশ্যযুক্ত সাধুগণের অধিকারের উন্নতি ও অন্তিম মঙ্গলার্থে সগুণ ও তটস্থ লক্ষণ-বিশিষ্ট নির্গুণব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠ-গৃহস্থ, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং সন্ন্যাসী এই চারি প্রকার আশ্রমীর অধিকারেই সেই মহামঙ্গল-জনক ব্যবস্থা সংলগ্ন হয়। তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য সগুণব্রহ্মারাধনা, জপ-যজ্ঞ ও মানস-যজ্ঞের সাধন, নির্গুণব্রহ্মতত্ত্ব- স্বরূপ আত্মজ্ঞানের আলোচনা, উপনিষদাদি বেদান্তশাস্ত্র পাঠ, এবং বিবেক ও বৈরাগ্য উপার্জ্জন করিবেন। অথচ, তাহার মধ্যে যিনি যে আশ্রমে থাকেন তিনি সে আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া ও আচার সকল প্রতিপালন করিবেন। ইহাই বিধি। বিধি ত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার করিয়া আশ্রমের নিয়ম ও শান্তিভঙ্গ করা মহাপাপ। শারীরকে (৩।৪।৪০) "তদ্ভূতস্যতুনাতদ্ভাবো

জৈমিনেরপিনিয়মাত্তদ্রূপাভাবেভ্যঃ” আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে পতিত হওয়া অতি নিন্দনীয়। আশ্রমের নিয়মভ্রষ্ট ব্যক্তির সকল ধর্ম্মের অভাব হয়। ইহা শুদ্ধ ব্যাসের বিচার নহে, জৈমিনিরও এই মত। “শব্দশ্চাস্যাকামকারে” (ঐ ৩১) ব্রহ্মোপাসক বা জ্ঞানী হইলেই যে যথেচ্ছাচার করিবে এমন নহে। বেদে তাহার নিষেধ আছে। যদি তাদৃশ ব্রহ্মোপাসক গৃহস্থ হন তবে তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রম-বিহিত, বেদবিধি-সম্মত যুগধর্ম্ম অনুযায়ী সমস্ত দৈব ও পিতৃকার্য্য ও লৌকিকাচার পালন করিতে হইবে। সেরূপ অনুষ্ঠান করিলে পাপ হয় না। কিন্তু না করিলে পাপ হয়। তন্মধ্যে ঘোরতর ব্রহ্ম-উপাসকেরা দিবানিশি ব্রহ্মোদ্দিষ্ট জপযজ্ঞ ও মানসযজ্ঞে ব্রতী থাকায় যদি কখনও বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম্মাদি পালনে অপারগ হন তাহাতে দোষ হয় না। কেননা* গীতাতে “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য” প্রভৃতি শ্লোকে অভয় দিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার আশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইলে সাধককে ভগবান আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ জন্য পাপ হইতে মুক্তি প্রদান করেন।

কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ ভাবে অনন্যচিন্ত্য হইয়া, সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম রোধ পূর্ব্বক, একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন নহেন তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত—আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া ও আচার ত্যাগ অশুভ এবং তৎপরিবর্ত্তে অশাস্ত্র ক্রিয়া ও আচার অবলম্বন ভয়াবহ। এই বর্ত্তমান কালে যে সকল যুবকগণ স্ব স্ব আশ্রম-ধর্ম্ম ও কুলাচারকে নিজ নিজ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অযোগ্য জ্ঞান করিতেছেন, তাঁহাদের এই শাস্ত্রীয় গভীর তত্ত্বটী ধারণ করা উচিত। যথা, যদিও আশ্রম-ধর্ম্ম ও

কুলাচার সমস্তই মায়িক ও অবিদ্যা-পরিকল্পিত। যদিও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা হৃদয় উজ্জ্বল হইলেই তাহার স্বপ্নবৎ অলিকত্ব অনুভূত হয়। তথাপি গৃহস্থ জ্ঞানী ভারত-সমাজ শাস্ত্র-বিহিত শিষ্টাচার রক্ষার্থ ও লোকহিতার্থ তাহা পালন করিবেন। কিন্তু তাহা মিথ্যা ইহা জানিবেন। মিথ্যা জানিয়া তৎপালনে হৃদয়ে সঙ্কল্পবর্জ্জিত ও বাহিরে—সমাজে ব্যাপার বিশিষ্ট হইবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা আশ্রম-ধর্ম্ম ও কুলাচারের এই মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া,স্বকপোলকল্পনা ও অভিনব যুক্তিসহকারে আপনাদের সংসার যাত্রার উপযোগী নূতনবিধ সমাজ বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন তবে তাঁহারা অনিষ্ট উৎপন্ন করিবেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক ভারতে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে এবং সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইবে। যদি বিজাতীয় সমাজে বা তদনুকরণে বিরচিত কোন আধুনিক আশ্রম-ধর্ম্মে যোগ দেন তাহাও মঙ্গলকর হইবে না। কেননা প্রথমতঃ কোন প্রকার ধর্ম্মক্রিয়া ও আচার, কোন প্রকার সমাজ ও আশ্রম দোষ শূন্য নহে। দ্বিতীয়তঃ যথার্থ জ্ঞান উপার্জ্জিত হইলে যদি ভারতীয় কর্ম্মকাণ্ড ও সদাচার ভ্রমযুক্ত ও মিথ্যা বলিয়া স্থির হয় তবে তাদৃশ জ্ঞান জন্মিলে অশাস্ত্র, স্বকপোল-কল্পিত,বিজাতীয় এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত বিবাহ,অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডও মিথ্যা বলিয়া স্থির হইবে। কেননা ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্বজাতীয় কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী। এই বেদান্তবিহিত মোক্ষজনক যথার্থ পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা শিষ্টাচার পরিপ্রাপ্ত, শাস্ত্রবিহিত, সনাতন সাধুবর্ত্মকে হেয় পূর্ব্বক বিজাতীয় বা নূতনবিধ কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছেন তাঁহাদের বিষম ভ্রম। সে ভ্রম কখনও নিরাকৃত হইবে না! কেননা হিন্দুশাস্ত্রের অন্ত-

র্গত ক্রিয়াকাণ্ড অন্তে—জ্ঞানাধিকারে হিন্দুশাস্ত্র দ্বারাই ভ্রম-যুক্ত বলিয়া সপ্রমাণিত হয়; কিন্তু ঐ বিজাতীয় বা কল্পিত অভিনব কর্ম্মকাণ্ডকে ভ্রমযুক্ত বা মিথ্যা বলিয়া দেয় নব্যদিগের সম্প্রদায় মধ্যে এমন কোন জ্ঞান-শাস্ত্র বিদ্যমান নাহি।

পরমার্থ-দৃষ্টিতে যেমন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ড ও সদাচার পরিত্যাগ করা এবং তৎপরিবর্ত্তে কতিপয় নূতন প্রকার ক্রিয়াপদ্ধতির সূত্রপাত করা অনুচিত বোধ হইতেছে, সেইরূপ ধর্ম্মদৃষ্টিতেও তাহা উচিত বোধ হইতেছে না। ভারতের বিধিপর ধর্ম্মই বিস্তীর্ণ ভারতসমাজের বন্ধন। ভারতীয় কর্ম্মকাণ্ড, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও সদাচারই ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি তাহাকে হতাদর করে সে সমাজ-কণ্টক। সে যে শুদ্ধ সমাজের অনিষ্টকারী এমন নহে; কিন্তু স্বয়ং চঞ্চল, ও উদ্ধত-স্বভাব। সে ব্যক্তি বিজাতীয় অনুকরণ-প্রিয়, নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রলোভনে বিমোহিত, লোভ বশতঃ অসংযত ও অনাচারী, এবং চপলতাবশতঃ বিদ্যা বুদ্ধি ও ব্রহ্ম-বাদাভিমানী। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত আচার ও ধর্ম্ম ত্যাগ করা অথবা অশাস্ত্র-আচার ও অবৈধ কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া ধর্ম্ম-দৃষ্টিতেও শুভকর নহে।

অতঃপর সাংসারিক ও সামাজিক সুখ সম্বন্ধেও সেরূপ পরি-বর্ত্তন উপকারী নহে। তুমি শাস্ত্রসিদ্ধ—কর্ম্মকাণ্ড ও আচারের কতিপয় বৈগুণ্য দেখিয়া হিন্দুসমাজ ত্যাগ ও নূতন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে। মনে করিয়াছ কি সেখানে কোন দোষ দেখিতে পাইবেনা? মনে করিয়াছ কি শাস্ত্রকৃত সমাজবন্ধন অপেক্ষা চঞ্চল-প্রকৃতি বুদ্ধি যুক্তির বিরচিত সমাজ সুপ্রশস্ত, সুদৃঢ় ও নিস্তরঙ্গ? যদি এমন মনে করিয়া থাক তাহা ভ্রম।

পরীক্ষা কর জানিতে অবশিষ্ট থাকিবে না। যাঁহারা নবীন-সমাজে প্রবেশ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতেছেন, যাও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা আপন আপন বক্ষে হস্ত-স্থাপন পূর্ব্বক বলুন তাঁহাদের অভিনব সমাজ সুখ শান্তির আশ্রম কি না? অনেক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তোমাকে বলিবেন যে, হিন্দুসমাজ সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূল, যুদ্ধকার্য্যের প্রতিকূল এবং রাজ্যশাসনের প্রতিকূল। কিন্তু তুমি তাঁহাদের কথা তৃণ তুল্য ত্যাগ করিও। কেননা নিতান্ত প্রয়োজন-স্থলে হিন্দুভাবে কি সমুদ্রযাত্রা করা যায় না, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কি ম্লেচ্ছদেশে বাস করা যায় না, হিন্দুভাবে কি রাজ্য-শাসন ও যুদ্ধকার্য্য করা যায় না? হিন্দুশাস্ত্রে কি তাহার ব্যবস্থা নাই? ফলে নব্যেরা এই বর্ত্তমান সময়ের বিজাতীয় বুদ্ধি-নিষ্পন্ন স্বপ্নাধিকারে সে ব্যবস্থার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে না। তাঁহারা হৃদয়ে হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেই ভারতীয় শাস্ত্র ও ধর্ম্মকে আপনাদের অনুকূল দেখিবেন। নতুবা বিজাতীয় আচার ও অবৈধ ধর্ম্ম পরায়ণ হইলে আর্য্যশাস্ত্র ও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কখনই তাঁহাদের অনুকূল হইবেন না। সে দোষ হিন্দু ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের নহে। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রকে রক্ষা করিলে শাস্ত্র ও ধর্ম্মও তাঁহাদিগকে পর্ব্বতে, অরণ্যে, সাগরে, ম্লেচ্ছরাজ্যে, রাজবিপ্লবে, রাজ্যশাসনে, সমরক্ষেত্রে, বাণিজ্যে, ও অন্যান্য সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিবেন। অতএব পরমার্থ, ধর্ম্ম, সাংসারিক সুখ, এবং স্বদেশের উন্নতি ইত্যাদি কোন দৃষ্টিতেই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ড ও আচার লঙ্ঘন কর্ত্তব্য বা প্রয়োজনীয় নহে। গীতাতে কহিয়াছেন।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপিচ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।৮।
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্মকৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচর।৯।
(গীতাঃ ৩অঃ)

অর্থ—হে কৌন্তেয় শাস্ত্রোপদিষ্ট যে সকল নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম তাহা নিয়ত কর। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা করা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মসকল কেবল সংসার বন্ধনমাত্র। কিন্তু যজ্ঞার্থ অর্থাৎ ঈশ্বরার্থ নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্মের যে সাধন তাহা বন্ধন নহে। অতএব বিষ্ণু প্রীত্যর্থ ক্রিয়া কলাপ সম্যকরূপে আচরণ কর।—

এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ করিলে ব্রহ্মোপাসকের কোন দোষ হয় না। অথচ, তদ্দ্বারা ভারতের সমাজ-শরীর অনাহত থাকে। বিশেষতঃ ব্রহ্মোপাসকের প্রতি ব্যবস্থাও আছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদযৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন। যে কোন কর্ম্ম করুন, অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি যে কোন ক্রিয়া তিনি করুন, তাহার ফল ত্যাগ পূর্ব্বক তাহা পরব্রহ্মেতে অর্পণ করিবেন।

এতাবতা গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার পক্ষে আশ্রম বিহিত তাবৎ ক্রিয়াকর্ম্মের আচরণ কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ক্রিয়াজনিত চিত্তশুদ্ধি লাভপূর্ব্বক ক্রমে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা উচিত। তাহা হইলে ক্রমেই তাঁহার হৃদয় আশ্রম-ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং তিনি ক্রমে অনা-শ্রমী সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন। আমরা ক্রমে ক্রমে মূল বক্তব্য হইতে অনেক দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই-ক্ষণে উদ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে ও স্বরূপ লক্ষণে উপাসনা করিতে পারা যায় না। কেননা স্বরূপতঃ তিনি প্রকৃতির অতীত এবং

কেবল "নেতি নেতি" ইহা নহে উহা নহে এই তাঁহার নির্দ্দেশ। কেবল মাত্র তটস্থ লক্ষণে ও সগুণভাবে তাঁহার উপাসনা সম্ভব। জগৎরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার আশ্রয় ও কারণস্বরূপ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করার নাম "তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম নিরূপণ"। জীবাত্মা, মনোবুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় ও কারণরূপে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করাও "তটস্থ লক্ষণ"। সূর্য্যের বরণীয়রূপে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করাও "তটস্থ লক্ষণ"। তিনি আমার দেহের, আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ এরূপ নির্দ্দেশও "তটস্থ লক্ষণ"। সে নির্দ্দেশ অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ-পরও নহে। কিন্তু তাহা পরোক্ষ ও অন্যাধীন। যাহা কিছু অন্য দ্বারা সম্পাদিত তাহাই অমুখ্য, অপ্রধান, গৌণ। যাহা গৌণ তাহা একাএক প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু অন্য সম্পাদ্য গুণ দ্বারা, অন্যের ব্যপদেশে, বিলম্বে নির্দ্দিষ্ট। ইহারই নামান্তর তটস্থলক্ষণ। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ স্বয়ম্প্রকাশ। আমাদের হৃদয়-নয়ন প্রকৃতিরূপ আবরণে আবৃত। সুতরাং তাঁহার দর্শন পাই না। কিন্তু অন্তর তাঁহার জন্য লালায়িত। এজন্য প্রকৃতি দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য করি। ব্রহ্মোপাসকগণের মঙ্গলার্থে শাস্ত্রে এই প্রকার তটস্থ ও সগুণ লক্ষণে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন।

অতঃপর অন্যান্য সগুণ-ভাবও আছে। উপাসক যদিও বাহ্যপ্রকৃতি দ্বারা—মৃত্তিকা ও পাষাণ দ্বারা তাঁহার প্রতিমা নাও করেন, যদিও প্রতিমাতে তাঁহার অধিষ্ঠান জ্ঞান পূর্ব্বক প্রতিমা পূজা নাও করেন, তথাপি প্রকৃতির রূপ বিশেষ যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, তদ্দারা তাঁহাকে চিত্র করিতে ক্রটী করেন না। আপনাকে নিরাকারের উপাসক বলিয়া যিনি

যতই মনে করুন প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাকার ভাবে উপাসনা সম্ভবে না। ব্রহ্মোপাসনা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে, কেননা বেদবেদান্ত প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই তাহার আদেশ দৃষ্ট হয়। কিন্তু উপাস্য-ব্রহ্ম মানস-ব্যাপার-পরতন্ত্র মাত্র। সে ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞান নহে। উপাসক ব্রহ্মকে মানসিক আকারে গ্রহণ করিয়া লন। প্রেম, দয়া, ক্ষমা, বুদ্ধিগত জ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তি সমূহ মানসিক প্রকৃতি মাত্র। সে সমস্ত গুণ প্রকৃতিরই রূপ। নব্যেরা সে সকলকে নিরাকার বলিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রে তৎসমস্ত একপ্রকার সূক্ষ্ম আকৃতি বলিয়াই গণ্য। সেই আকৃতি ব্রহ্মে প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে দয়াময়, প্রেমময় ইত্যাদি বলিলেই তাঁহাকে সাকার করা হইল। এক প্রকার সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করা হইল। ফলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে এইরূপ সাকার ও সগুণ-ভাব ব্যতীত অপরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ,নির্গুণ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব। যতদিন প্রকৃতিদ্বারা জীবাত্মা বদ্ধ থাকিবেন, ততদিন আকৃতির প্রাদুর্ভাব থাকিবেই। ব্রহ্মকে কথায় নির্গুণ অপরিচ্ছিন্ন, ভূমা, অসীম, বাক্য মনের অগোচর ইত্যাদি যতই বলা যাউক, কার্য্যে, উপাসকের স্বীয় বন্ধন স্বরূপিণী প্রকৃতি তাঁহার রূপ-কল্পনা করিবেই। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

মহাত্মা রামমোহন রায় যখন উন্নত অধিকারীগণের নিমিত্তে শাস্ত্র বিহিত ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা দেন, তখন তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রূপ, গুণ, অবলম্বন ও নির্দ্দেশের হাত ছাড়াইবার যো নাই। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনায় শাস্ত্রীয় নির্গুণ, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ, নিরবয়ব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের ক্রুটী করেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থায় শাস্ত্র সম্মত অবল-

ষ্মন সকল গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অনুষ্ঠান গ্রন্থে লিখিয়াছেন "তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়"। শাস্ত্রানুসারে উপাসনা শব্দের অর্থ 'সেবা' বা 'তুষ্টির উদ্দেশে যত্ন'। যদি বলা যায় যে ঈশ্বরের উপাসনাও তাঁহার তুষ্টির উদ্দেশে, তাহা হইলে তাদৃশ উপাসনা অতি স্থূল এবং ঘোরতর সগুণ। এ জন্য রামমোহন রায় লিখিয়াছেন (ঐ) "কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে (নির্গুণব্রহ্মপক্ষে) জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি"। কে উপাস্য? এবং তিনি কি প্রকার? এই প্রশ্ন দ্বয়ের উত্তরে রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে পুনশ্চ কহিতেছেন "যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনি উপাস্য হন। ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না। তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না"। "পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি" মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই উক্তি সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র সম্মত। পঞ্চদশী-ধ্যানদীপে আছে "অস্তি ব্রহ্মেতি সামান্য জ্ঞানমত্র পরোক্ষধীঃ"। (১৫) পরব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনায় পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্ভব। পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র অবলম্বনীয়। বুদ্ধি বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরব্রহ্মকে হৃদয়ে উপলব্ধি করা কঠিন হইলেও কেবল "শাস্ত্রাৎ সত্যজ্ঞানাদি বাক্যজাতং ব্রহ্মাস্তীত্যেবং সামান্যাকারেণ জায়মানং জ্ঞানমত্রস্যামুপাসনায়াং পরোক্ষধীঃ পরোক্ষজ্ঞানং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ"। শাস্ত্র-অবলম্বন দ্বারাই জগৎকারণ পরব্রহ্ম আছেন এই প্রকার সামান্যজ্ঞান মাত্রই উপাসনার সম্বল। তাহা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞান। তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণও নহে কিন্তু তটস্থ লক্ষণ। এইরূপ

তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মোপাসনা ও নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানের আবৃত্তির জন্য উক্ত মহাত্মা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ফলে সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিই নির্গুণালোচনায় পারগ হন নাই। বরং অনেকে বিশুদ্ধ তটস্থ লক্ষণকেও রক্ষা করিতে পারেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে স্থূলতর চিত্তব্যাপার-মিশ্রিত সগুণোপাসনায় অবতরণ করিয়াছেন। তাহাতে ক্রমে পার্থিব মোহের অশ্রুপাত নির্গুণ-ব্রহ্মানন্দের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণে লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম-চিন্তনে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে এবং প্রণব-উপনিষদাদি-বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবৎ বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন এইরূপ চিন্তা করিবেন। যে হেতু ইহার অতিরিক্ত তাঁহার যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধিগম্য নহে। * * * কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার নিরূপণ হইতে পারে না।" উক্ত মহাত্মা মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভূমিকায় কহিয়াছেন "পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদান্তের সর্ব্বত্র কহেন।" * * * যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোন এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মনন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার

বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে।” রামমোহন রায়ের এই কয়েকটী উপদেশের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মস্বরূপ বুদ্ধি গম্য নহে। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু পুরুষের কর্ত্তব্য বেদান্তের শ্রবণ মনন দ্বারা পরমাত্মার অনুশীলন করেন। অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্ম বিষয়ক বৈদান্তিক জ্ঞানের আবৃত্তি করেন। এখানে “উপাসনা” শব্দের পরিবর্ত্তে “অনুশীলন” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা এস্থলে নির্গুণ-আলোচনা অভিপ্রেত। নির্গুণব্রহ্মেতে যে নিষ্ঠা বা তদ্বিষয়ক জ্ঞানের যে আলোচনা তাহাকে সকলে “উপাসনা” কহিতে চান না। ফলতঃ ইতিপূর্ব্বে বলাগিয়াছে যে রামমোহন রায় তাদৃশ জ্ঞানের আবৃত্তিকে “উপাসনা” কহিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে পরব্রহ্ম বিষয়ে “উপাসনা” নাই, কেবল বৈদান্তিক জ্ঞানের আবৃত্তি বা আলোচনা মাত্রই তাঁহার “উপাসনা”। এই প্রকার জ্ঞানানুশীলন দ্বারা স্বয়ম্প্রকাশ নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। কিন্তু তাহার অধিকারী বিরল। এইজন্য তিনি তদসমর্থ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধ ন্যূন কল্পের উপদেশ দিয়াছেন। সেই ন্যূন কল্প কি? না, পরব্রহ্মকে প্রণবের অধিষ্ঠাতা, হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা, পঞ্চযজ্ঞাদির আশ্রয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ইত্যাদি প্রকার চিন্তন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও প্রণব উপনিষদাদি-বেদাভ্যাস। এই প্রকার সাধনকে “ব্রহ্মোপাসনা” কহা যায়। রামমোহন রায় তাহাই কহিয়াছেন। এরূপ উপাসনা ন্যূন কল্প মাত্র এবং শাস্ত্রানুসারে তাহা ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পরোক্ষ জ্ঞান ভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানানুগত নহে। পঞ্চদশী ধ্যানদীপে কহিয়াছেন—

“স্বয়ং ভ্রমোপি সম্বাদী যথা সম্যক্ ফলপ্রদঃ। ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা (১৩) ইহার তাৎপর্য্য এই

যে ভ্রম দ্বিবিধ। সম্বাদি ও বিসম্বাদি। তন্মধ্যে বিসম্বাদি-ভ্রম ফলজনক নহে। মণিপ্রভাকে মণি বলিয়া ভ্রম হইলে সেই প্রভার অনুসরণ দ্বারা অন্বেষকের মণি লাভ সম্ভব। কিন্তু যে ব্যক্তি দীপ-প্রভাকে মণি ভ্রমে মণি অন্বেষণ করে সে মণি লাভে বঞ্চিত হয়। এস্থলে প্রথমোক্ত ভ্রম সম্বাদি এবং শেষোক্ত ভ্রম বিসম্বাদি। ইন্দ্রিয় সুখকে নিত্য সুখ ভ্রমে তদনুগামী হইলে নিত্য সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু মৃত্তিকা, দারু, শিলা বিনির্ম্মিত মূর্ত্তিকে দেবতা ভ্রমে পূজা করিলে ক্রমে পরমাত্মদৃষ্টি সম্ভব। অতএব "যেমন সম্বাদি ভ্রম স্বয়ং ভ্রমরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াও সম্যক্ ফল লাভের হেতু হয় তদ্রূপ নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনাও মুক্তি ফল লাভের কারণ হয়।"

এই বচনটীতে নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠপদে আছে। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা উক্ত সম্বাদি-ভ্রমের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাতে চমৎকৃত হওয়া উচিত নহে। ব্রহ্মের জ্ঞানই সত্য। তোমার আমার কৃত উপাসনা ব্রহ্মরূপ পরম-মণি-তন্ত্র সত্য জ্ঞান নহে। তাহা ভ্রমই। কিন্তু তাহা ফল-জনক ভ্রম। কেননা তাহার অনুসরণে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এই কারণে উক্ত ধ্যানদীপে উক্ত প্রকার উপাসনাকে নির্গুণ-উপাসনা বলিয়া আদর করিয়াছেন। ফলতঃ উহা সগুন-ভাব প্রতিপালিত নির্গুণ-উপাসনা। নতুবা নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণোপাসনা অসম্ভব। যদি নির্গুণব্রহ্মের জ্ঞানানুশীল-নকে নির্গুণ-উপাসনা বলিতে চাও, অথবা যদি সগুণভাব প্রতিপালিত উক্ত নির্গুণ-উপাসনাকে জ্ঞান সাধন বলিতে চাও তাহাতে আমরা প্রতিবাদী নহি। কেননা ভাব গ্রহণই উপা-দেয়। শব্দ লইয়া বিবাদ নিষ্ফল। এস্থলে আমাদের ইহাই জ্ঞাপনীয় যে নির্গুণ ও নিরাকার উপাসনা শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ

সম্ভব না হইলেও সগুণভাবে নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মের উদ্দেশে ব্রহ্মোপাসনা শাস্ত্রসিদ্ধ। যাঁহারা বলেন ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব তাঁহারা কিরূপ দৃষ্টিতে শাস্ত্র পড়িয়াছেন জানিনা। আর যাঁহারা বলেন আমরা নিরাকার ব্রহ্মোপাসক অথচ ব্রহ্মের নির্গুণত্ব স্বীকার করেন না তাঁহারা আদৌ শাস্ত্র পড়িয়াছেন কি না সন্দেহ।

প্রকৃত প্রস্তাবে নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্ব-বিদ্যাতে গুণোপসংহার করা শাস্ত্র সঙ্গত। মহাত্মা রামমোহন রায় সগুণের যোগে যে নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা অশাস্ত্র করেন নাই। উপাস্য ব্রহ্মেতে যে নির্গুণ ভাব প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও অশাস্ত্র করেন নাই। ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থায় শারীরক সূত্র, পঞ্চদশী প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই সগুণ নির্গুণ উভয় ভাবই মিশ্রিত দৃষ্ট হয়। যদি মিশ্রিত না থাকিত তবে সগুণের যোগে নির্গুণে আরোহণ অসম্ভব হইত। এরূপ মিশ্রণকে অনেকে ভাল না বাসিতে পারেন। বস্তুতঃ সগুণ নির্গুণের বিচারে মিশ্রণ ভাল নহে। উপাসনা স্থলে উভয় উপকরণই প্রয়োজনীয়। তাহাতে দোষ হয় না। প্রাগুক্ত ধ্যানদীপে কহিয়াছেন।—

আনন্দাদের্ব্বিধেয়স্য গুণ সংঘস্য সংহৃতিঃ।
আনন্দাদয়ইত্যস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেনবর্ণিতা। ৬৮॥
অস্থূলাদেনির্ষেধ্যস্য গুণ সংঘস্য সংহৃতি।
তথাব্যাসেন সূত্রেঽস্মিন্নুক্তাক্ষরধিয়াস্থিতি ॥৬৯।
নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াং গুণসংহৃতিঃ।
ন যুজ্যেতেত্যুপালম্ভো ব্যাসং প্রত্যেবমাস্তু ন। ৭০

ব্যাসকর্ত্তৃক শারীরকে আনন্দাদি গুণ সকল পরব্রহ্মেতে উপসংহৃত হইয়াছে। অস্থূল, অনণু প্রভৃতি নির্গুণ ভাব শারীরকে ব্যাস কর্ত্তৃক উপাস্য ব্রহ্মেতে

উপসংহৃত হইয়াছে। অতএব নির্গুণব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যাতে গুণোপসংহার করা অযুক্ত বলিয়া যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন তবে সে পূর্ব্বপক্ষ আমাদের প্রতি সম্ভবে না। তাহা ব্যাসের প্রতিই অর্শে।

মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনাগ্রন্থে যে ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি লিখিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে তাহা সগুণ নির্গুণ মিলিত। উক্ত মহাত্মা শাস্ত্রীয় নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞান এবং সগুণভাবে উপাসনা ও তৎফল, এই দুই তত্ত্বকে স্বীয় গ্রন্থাবলির অনেক স্থলেই মিশ্রিত রূপে বিবৃত করিয়াছেন। কেননা কেবল উন্নত অধিকারী গণকে ব্রহ্মোপাসনায় ব্রতী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সগুণ নির্গুণ ঘটিত বিচার লইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা লক্ষ্য ছিল না। তিনি মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় (৫৯৭ পৃ) এবং কবিতাকারের প্রতি প্রত্যুত্তরে (৬৫৯ পৃ) কহিয়াছেন।—

> "নামরূপ উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা করিয়া নিরুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবে না। যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনা নিরুপাধি হইবার অন্য কোন উপায় নাই। বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ৩ পাদে ১৫ সূত্রে লিখেন। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। (স্থূল) অবয়বের উপাসক ভিন্ন যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহাদিগেরই অমানব পুরুষ (বিদ্যুৎপুরুষ) ব্রহ্ম প্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহা বেদব্যাস কহেন। যেহেতু দেবতাদের উপাসক আপন আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোক গতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।"

মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই উপদেশের প্রথম ভাগ অর্থাৎ "আত্মজ্ঞান বিনা নিরুপাধি হইবার অন্য কোন উপায় নাই" ইহা নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক। কেননা "আত্মজ্ঞান" উপাসনা নহে। তাহা সম্পূর্ণ বৈরাগ্য সহকৃত পর-

আত্ম-বোধ মাত্র। তাহা সাক্ষাৎ মোক্ষস্বরূপ। তাহার ফল উত্তর-মার্গগতি বা ব্রহ্মলোক-গতি নহে। রামমোহন রায় ঈশোপনিষদের শেষে "নতস্যপ্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইত্যাদি বেদবাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক দর্শাইয়াছেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানী" (আত্মজ্ঞানী) শরীর ত্যাগের পর স্বর্গাদি ভোগ না করিয়া এই লোকেই (এইখানেই) ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু প্রাগুক্ত উপদেশের দ্বিতীয় ভাগে "অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি" ইত্যাদি যে বেদান্তসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল সগুণব্রহ্মোপাসনার অধিকারে সংলগ্ন হয়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা স্থূল প্রতিমার উপাসক নহেন, কিন্তু সগুণভাবে পরব্রহ্মের উপাসক, তাঁহাদের উত্তরমার্গে গতি হইয়া দেবযানের ঊর্দ্ধতম ব্রহ্মলোক কিনা সত্যলোকে স্থান হয়। অমানব বিদ্যুৎপুরুষ তাঁহাদিগকে তথা বহন করেন। তথায় তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এস্থলে বুঝা উচিত যে এই প্রকারের পরব্রহ্মোপাসকেরা সগুণোপাসক মাত্র। তাঁহাদের প্রাপ্য ফল যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন তিনিও সগুণরূপে লব্ধ হন। কেননা প্রথমতঃ বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদটী সমুদয়ই সগুণগতি বা সগুণমুক্তি প্রতিপাদক। তাহাতে সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের উত্তরমার্গে গতির বিচার মাত্র আছে। শারীরকের (৩।৩।৩০) "উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেলোকবৎ" এই সূত্রে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে তটস্থ লক্ষণে, বিরাটভাবে, কিম্বা হৃদয়াকাশে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহাদের দেবযান-গতি হয়। ব্রহ্মস্বরূপ-নিষ্ঠ আত্মজ্ঞানীর এইখানেই মোক্ষ। দ্বিতীয়তঃ চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টমাবধি চতুর্দ্দশ সূত্রে তাদৃশ ব্রহ্মোপাসকগণের প্রাপ্তব্য ব্রহ্ম-ভাবের গু-

নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্মের সে ভাবের নাম "কার্য্যব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্মা। সুতরাং তাহা সগুণ। ব্রহ্মার লোক বলিয়া সত্যলোকের নাম ব্রহ্মলোক। সগুণব্রহ্মোপাসকেরা তথা গিয়া ক্রমে নির্গুণমুক্তি পান। এস্থলে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রহ্মের অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ পরম ভাবকে উচ্চ আদর্শরূপে স্থির রাখিয়া ব্রহ্মোপাসনাধিকারে সগুণভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা অশাস্ত্র হয় নাই।

বেদান্তের ঐ পাদে ষোড়শ সূত্রে আছে "বিশেষঞ্চদর্শয়তি" ইহার অর্থ এই যে স্থূল মূর্ত্তিতে ব্রহ্মোপাসনা হইতে বাক্য-মনে ব্রহ্মোপাসনা উৎকৃষ্ট। ঐ উভয়ের মধ্যে বিশেষ আছে। এই বিশেষতা জন্যই আন্তরিক উপাসকের উৎকৃষ্ট গতি হয়। ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠতা ঘোষণার্থে মহাত্মা রামমোহন রায়ও এই সূত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ এইরূপ উপাসনা সহস্র সূক্ষ্ম হইলেও তাহা আত্মজ্ঞানের তুলনায় সাকারোপাসনাই। কেননা তাহা উপাসকের মানসিক আকার দোষে দূষিত। শাস্ত্রেও উপাসনার ঐ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। "উপাসনানি সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক মানসব্যাপার রূপাণি" (বেঃ সাঃ) মানসপ্রকৃতির গুণদ্বারা বিরচিত সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানসব্যাপারের নাম উপাসনা। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রানুসারেই কহেন যে নিরাকারের উপাসনা হয় না। নিরাকারের অর্থ শারীরিক মানসিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্থূল সূক্ষ্ম গুণশূন্য। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের উক্তি এই যে ব্রহ্মোপাসনা সগুণ। যখন সগুণ তখন তাহা সাকারেরই উপাসনা। কেননা উপাস্য ব্রহ্ম সূক্ষ্ম-দেহরূপ উপাদানে কল্পিত। শাস্ত্রের ও জ্ঞানীদিগের এই

সকল কথায় আমাদের ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। কে কি ভাবে কথা কহে তাহা অগ্রে বুঝা উচিত। তাহার মূলস্বরূপ শাস্ত্র জানা উচিত। তবে ক্রোধ করিলে শোভা পায়। ফলে যাঁহারা বিলাতি বিদ্যা-বুদ্ধিরূপ মুদ্গর ধরিয়া একেবারেই ভারতীয় শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের মস্তক চূর্ণ করিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

বিধি, যোগ ও মোক্ষ বৈদিক ধর্ম্মের এই তিনটী অবয়বের মধ্যে মোক্ষই প্রধান। তাহাতেই সর্ব্ব কর্ম্ম ও সকল বিদ্যার অন্তিম উদ্দেশ্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে ঐ মোক্ষরূপ অবয়বটীকে উপাসনার অবিষয় নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা এই দুই ভাগে দেখাইয়াছি। ইহাও বলিয়াছি যে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা একেবারে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত নহে। সুতরাং আচার্য্যেরা কর্ম্মাধিকারে তাহাকে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি যেমন নিত্যকর্ম্ম; জাতকর্ম্ম বিবাহ,শ্রাদ্ধাদি যেমন নৈমিত্তিক কর্ম্ম; স্বর্গাদি ফলকামনা বিশিষ্ট ব্রত, যজ্ঞ, ও প্রতিমা উপলক্ষিত দেবার্চ্চনা যেমন কাম্যকর্ম্ম; পাপক্ষয় নিমিত্ত চান্দ্রায়ণাদি ব্রত যেমন প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম; সগুণ মুক্তিজনক সগুণ ব্রহ্মোপাসনাও সেইরূপ "সোপাসনকর্ম্ম" ফলকামী যজমান যেমন আন্তরিক ভক্তি অনুভব ও জ্ঞানসম্বন্ধবর্জ্জিত হইয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাহা অশাস্ত্র হয়না; সগুণ-ব্রহ্মোপাসক সেরূপ নির্জ্জীবভাবে বা স্বার্থবশে ব্রহ্মোপাসনা করেন না। তিনি প্রীতি ও হৃদয়ের যোগে জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি সগুণ হৃদয়বিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মারাধনা করায় ব্রহ্ম তাঁহার নিকটে সগুণরূপে প্রতীয়মান হন বটে; কিন্তু নির্গুণব্রহ্মেতেই তাঁহার নিষ্ঠা থাকে

এবং পার্থিব বা স্বর্গীয় কোন স্থূল বিষয়বাসনা তাঁহার হৃদয়ে থাকেনা। এজন্য জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারে সগুণব্রহ্মোপাসনা জ্ঞানকাণ্ড বা নিবৃত্তিধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তদ্রূপ হইবার আরও কারণ এই যে, প্রথমতঃ বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড স্বরূপ উপনিষৎ শাস্ত্রের মধ্যে এবং তম্মীমাংসাস্বরূপ বেদান্তদর্শনের মধ্যেই সগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি ও তাহার বিচার এবং সগুণব্রহ্মোপাসনার উপদেশ আছে। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা জ্ঞানকাণ্ডেরই মধ্যগত। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মোপাসক সংসারনিষ্ঠ নহেন। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ। তাঁহার চিত্ত ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উন্নতি পরম্পরা ক্রমনিবৃত্তিভাগী। এজন্য ব্রহ্মোপাসনা নিবৃত্তিধর্ম্মেরই অন্তরঙ্গ। মহাত্মা রামমোহনরায়ও সেই কারণে অনেক স্থলে নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণব্রহ্মোপাসনাকে একাধিকরণে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মোপাসকগণকে নির্গুণ, নিরুপাধিক, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবোধিত করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা নূতন নহে কিন্তু শাস্ত্রীয় শুভাভিপ্রায় সঙ্গত। যাঁহারা এইরূপ ব্রহ্মোপাসনার বিরোধী, শাস্ত্রে তাঁহাদের যথার্থ দৃষ্টি আছে কি না সন্দেহ। অতঃপর যাঁহার শাস্ত্র সম্মতরূপে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে সেই ব্যক্তিই যে বেদ অথবা তন্ত্রমতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী তাহাও রামমোহনরায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রায় সেরূপ অধিকারী মেলে নাই। এইক্ষণ অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত তাহা রামমোহন রায়ের প্রচারিত শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। কিন্তু তাহা রূপান্তরিত খৃষ্টধর্ম্ম বা বিলাতী যুক্তি নিষ্পন্ন সভ্যতা মাত্র।

# অষ্টম অধ্যায়।

## লোক শিক্ষার্থে এবং নিষ্কাম ও ব্রহ্মার্পিতভাবে সামাজিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান।

"বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি" (শাঃ সূঃ ৩।৪।৩২) ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতিও বেদে কর্ম্মকাণ্ড আচরণের বিধান আছে। "অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ" (ঐ ৩৯) ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে তাহা আচরণ করাই শ্রেষ্ঠ। 'কর্ম্মণৈবহি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌কর্ত্তুমর্হসি'। (গী ৩।২০) জনকবশিষ্ঠাদি ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণও কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তুমি যদি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ বলিয়া জান তথাপি জনসমাজের মঙ্গলার্থ, সমাজকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, এবং লোকদিগের অধিকারানুযায়ী সামাজিকধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তোমার আশ্রমবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ কর্ত্তব্য। নবুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌যুক্তঃ সমাচরন্‌। গীতা (৩।২৬) জ্ঞানীব্যক্তি ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা অজ্ঞ ক্রিয়াফলাশক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ করিবেন না। বরং স্বয়ং সাবধানে নির্লিপ্তভাবে বেদবিহিত কর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই সবকর্ম্মে যোজনা করিবেন। "সর্ব্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ" (শাঃ সূঃ ৩।৪।২৬) যাঁহাদের নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই, অথচ যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছুক ও ব্রহ্মোপাসক, নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানে প্রবোধিত নাহওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে যজ্ঞাদিকর্ম্মই চিত্তশুদ্ধিজনক। "এতান্যপিতুকর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলানিচ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং"। গীঃ ১৮।৬। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল বিবেকীগণের চিত্তশুদ্ধিকর। কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মার্পিতভাবে তাহা করা কর্ত্তব্য। ইহাই উত্তম মত। এইরূপ আচরণ দ্বারা জ্ঞানী, উপাসক ও কর্ম্মী সকলেরই দ্বারা ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্ম রক্ষাপায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা উভয়ই বেদের নিবৃত্তিকাণ্ডের অন্তর্গত। ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপা-

সক সংসারনিষ্ঠ নহেন। তাঁহারা বাহ্যতঃ সংসারে প্রবৃত্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর নির্লিপ্ত। পূর্ব্বে ইহাও বলা গিয়াছে যে, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারি প্রকার আশ্রমীর মধ্যেই নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানী বা সগুণব্রহ্মোপাসক থাকিতে পারেন। নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানীগণের কোন ক্রিয়া নাই, উপাসনা নাই, ধ্যান নাই, সমাধি নাই। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে অটল। তাঁহাদের নিকটে কর্ম্মফলসহ অদৃষ্ট, শাস্ত্র, দেবগণ, ও ফলদাতা স্বরূপ ঈশ্বর অনিত্য, অসিদ্ধ ও ইন্দ্রজাল। মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার রূপ বাসনার গগনে ঐ সকল অলিক-তত্ত্ব সুরতরঙ্গিনী ও গন্ধর্ব্ব নগরীর ন্যায় দৃশ্যমান হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞানোদয়ে তাহাদের অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিরূপ ঐশ্বর্য্যের স্বামিত্ব বশতঃ পরব্রহ্মের ঈশ্বর উপাধি হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞানোদয়ে প্রকৃতিরূপ মায়া বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরোপাধিও অসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এতাদৃশ অদ্বয়-ব্রহ্মাত্মভাববিশিষ্ট, নিবৃত্তি-কাম, জীবন্মুক্ত, স্বাধীন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষদিগের কোন ক্রিয়া, ও সাধনা নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব আশ্রম ত্যাগে ক্ষমবান—প্রত্যুত কোনরূপ আশ্রমেরই অপেক্ষা রাখেন না তাঁহারা কোন নিয়মে বদ্ধ নহেন। কিন্তু যে সকল ব্রহ্মজ্ঞানী কোন না কোন প্রকার আশ্রমবাসী আশ্রমের নিয়ম পালন করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা গৃহস্থ হন তবে গৃহস্থের প্রতিপালনীয় শাস্ত্রবিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক, দেব, পিতৃ প্রভৃতি তাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান করাকর্ত্তব্য। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহাদের কোন ক্রিয়া নাই তথাপি তাঁহাদের আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য বলিয়া কেন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে?

একথার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য—গীতাই বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের এবং কর্ম্ম, ব্রহ্ম, বিবেক, বৈরাগ্য, যোগাচার, মোক্ষ প্রভৃতি সর্ব্ব ধর্ম্মের মীমাংসাক্ষেত্র। সেই গীতা শাস্ত্রের মধ্যে ঐ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর আছে। যথা শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—

যাঁহার পরমাত্মাতে রতি, পরমাত্মাতেতৃপ্তি, পরমাত্মাতেই সন্তোষ তাদৃশ ভোগেচ্ছা বিরহিত তত্ত্বজ্ঞানীর কোন ক্রিয়াকর্ম্ম নাই। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানীরা বিধি নিষেধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম করিলে পুণ্য নাই এবং না করিলে পাপ নাই। কিন্তু হে অর্জুন তুমি যদি সেরূপ জ্ঞানী হইয়া থাক তথাপি লোকদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেননা তুমি যদি জ্ঞানী হইয়া থাক তবে সমগ্র জনসমাজ তোমাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবে। তুমি যদি কর্ম্ম ত্যাগ কর, তবে অজ্ঞানীরাও তোমার দৃষ্টান্তে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করিবে। যেহেতু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্ম্ম-শাস্ত্র বা নিবৃত্তি-শাস্ত্র যাহা প্রামাণ্য করিয়া মানেন সামান্য লোকেরা তদনুযায়ী আচরণ করে। হে পার্থ! এ বিষয়ে আমাকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ কর। এই ত্রিভুবনে আমার অভিলাষযোগ্য কোন বস্তু নাই এবং কিছুমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। তথাপি দেখ আমি কর্ম্ম করিতেছি। যদি আমি কদাচিৎ অলসরহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি তবে আমারই চলিত পথে সকলেই চলিবে। তাহা হইলে জনসমাজের ধর্ম্ম লোপ হইবে, সমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে, সমাজে বর্ণসঙ্কর জন্মিবে এবং তজ্জন্য আমিই অপরাধী হইব। অতএব হে অর্জ্জুন! অজ্ঞানী মনুষ্য সকল কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানীর কর্ত্তব্য যে লোকের প্রতি কৃপা করিয়া, লোকশিক্ষার্থ আসক্তি রহিত হইয়া সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। জনসমাজের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নহে। তাহাদিগকে ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ড হইতে বিচলিত করিবেন না। জ্ঞানী স্বয়ং নির্লিপ্ত ভাবে ও সাবধানে কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ করাইবেন। নতুবা তাহাদিগের প্রতি ব্রহ্মোপদেশ

করিলে কর্ম্মকাণ্ডে অশ্রদ্ধা জন্মিবে অথচ অনধিকার বশতঃ ব্রহ্মোপদেশও সফল হইবে না। তাহাতে তাহাদের কর্ম্ম, ব্রহ্ম উভয় পথই নষ্ট হইবে। যদি বল ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্ম-কাণ্ডে রতি, মতি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, না থাকিলেও যদি তাঁহার তদাচরণ কর্ত্তব্য হইল তবে তাঁহার সহিত অজ্ঞানীর কি বিশেষ থাকিল। একথার উত্তর এই যে, মূঢ় ব্যক্তিরা স্ব স্ব প্রকৃতি নিষ্পন্ন সমস্ত কার্য্যেরই "আমি কর্ত্তা" এই রূপ মানিয়া লয়। তাহার কারণ এই যে, তাহারা অধ্যাসে বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যকে আত্মার কার্য্য মনে করে। কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মাকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রভৃতি বহির্ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র জানেন। যে জ্ঞানী সমস্ত কৃত-কর্ম্মকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন তিনিই তত্ত্ব-জ্ঞানী। তিনি কর্ম্মে আসক্ত হন না। কেননা তিনি 'আমি কর্ম্ম করি' এরূপ অভিমান শূন্য। এতাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়াসক্ত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত মন্দমতি ব্যক্তির প্রতি ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিয়া তাহার বুদ্ধিভেদ করিবেন না। প্রত্যুত তাহার বৈরাগ্য-উদয় ও অধিকারের উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সামাজিক বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মে আবদ্ধ রাখিবেন।—

পঞ্চদশীতেও আছে :—

"তত্ত্ববিত্ত্ববিরোধিত্বাল্লৌকিকং সম্যগাচরেৎ"। ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি লৌকিকাচার সকল সম্যক্ প্রকারে পালন করিবেন। যেহেতু তাঁহার জ্ঞান কোন প্রকারে সংসারের বিরোধী নহে। জগৎ মায়াময় ও আত্মা চৈতন্য স্বরূপ এরূপ তত্ত্বজ্ঞান লৌকিকাচারের বিরোধী নহে। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সাংসারিক বস্তুর অসত্যতা জানিয়াও তদ্বিষয়ক ব্যবহারের অপেক্ষা করেন এবং আত্মা চেতন-স্বভাব জানিয়াও তদ্বিষয়ক জ্ঞান সাধনার্থ লৌকিক ব্যবহারকে স্বীকার করেন।

এই সকল মীমাংসার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানী-গণের যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করায় তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কোন কার্য্য হয় না, অথচ আশ্রমধর্ম্ম রক্ষা পায় এবং তাঁহা-দিগের দৃষ্টান্তে নিম্নাধিকারীগণের মঙ্গল হয়। তাঁহারা জ্ঞান ও বিশ্বাসে জানেন যে পরমার্থতঃ এ সংসার মায়াময়; দেহ

মনাদিতে আত্মবোধ ভ্রম মাত্র ; স্বর্গ, নরক, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ ভ্রম মাত্র ; স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, যশোমান মায়াস্বপ্ন মাত্র; তথাপি ব্যবহারিক অবস্থায় সে সমস্ত সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তাহা পরিত্যাগ করিলে সৃষ্টির শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হয়। অতএব সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম যেমন এই অসত্যস্বভাব মায়া রাজ্যের মধ্য দিয়া জীবগণকে ক্রমে উন্নতির অধিকারে আকর্ষণ করিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও সেইরূপ স্বরূপতঃ মিথ্যা সামাজিক কর্ম্মকাণ্ডের মধ্য দিয়া নিম্নাধিকারীগণকে মানুষ করিয়া তুলেন। তাঁহারা দেহ-ব্যবহার মিথ্যা জানিয়াও যেমন বাহ্যতঃ তাহা পালন করেন, সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ড সকল অজ্ঞানের কার্য্য জানিয়াও সমাজ-শরীরকে রক্ষার নিমিত্তে তাহা পালন করিয়া থাকেন। কোন প্রকার সমাজ, আশ্রম, বা সামাজিক ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি,আকর্ষণ বা প্রলোভন নাই। কেবল ভারতীয় শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তে ঐরূপ নির্ব্বেদ-ভাব উপার্জ্জিত হয়; অথচ তাদৃশ জ্ঞানোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ও শাস্ত্রচিন্তা জ্ঞানমঞ্চে আরোহণের পক্ষে সুদৃঢ় সোপান স্বরূপ হইয়া থাকে। সোপান যদিও মুখ্য নহে, তথাপি দৃঢ়, পরিশুদ্ধ ও সর্ব্ব প্রকার অধিকারীর উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বৈদিক ধর্ম্ম ও বিধি সেই সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন। জ্ঞানমঞ্চে উঠিলে তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। তাহার অন্তর্গত অনন্ত স্বর্গসুখ তৃণ তুল্য বোধ হয়। তাহার অধিকারভূত হৈরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মপদ গোষ্পদতুল্য বোধ হয় এবং আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত স্বপ্নবৎ অলিক বলিয়া অনুভূত হয়। জ্ঞানাধিকারে—পরমার্থতঃ সেই সোপানগত তাবতীয় কার্য্য ও অবান্তর ফল বাস্তবিকই মায়া স্বপ্ন।

স্বপ্ন যদিও মিথ্যা, কিন্তু ভয়জনক দুঃস্বপ্ন প্রার্থনীয় নহে। জ্ঞানে জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রলয়রূপ সুষুপ্তি ও কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তৎফল স্বর্গাদি ভোগরূপ স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয় ঘটিবেই। যাহাতে তাদৃশ স্বপ্ন শুভ হয় তাহাই প্রার্থনীয়। বৈদিকধর্ম্ম-রূপ স্বপ্ন রাজ্য অর্থাৎ বেদপাঠাদি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি এক-গুণ মানুষা-নন্দ অবধি কোটিগুণ যোগৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ত আনন্দব্যাপার। তাদৃশ প্রভূত ও পবিত্র সুখ ধর্ম্মান্তরে নাই। সেই হেতু, ব্রহ্মজ্ঞানীরা ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ডের বিপর্য্যয় ইচ্ছা করেন না। সেই সমাজের কোন অশাস্ত্র, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, শান্তিভঙ্গকর সংস্কার অভিলাষ করেন না। বরং আপনারা নির্লিপ্ত থাকিয়া উপ-দেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতবাসীগণকে সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও শাস্ত্র শ্রবণে উৎসাহ দিয়া থাকেন। শারীরক দর্শন, গীতা, পঞ্চদশী, পুরাণ, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই এই সিদ্ধান্ত। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীগণ আশ্রম ত্যাগে ক্ষমবান হইলেও, সে ত্যাগ অপেক্ষা লোক শিক্ষার্থ আশ্রমধর্ম্ম—বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম পালন করা তাঁহাদের পক্ষে উত্তম কল্প। শারীরকে "বিহিতত্বাচ্চা-শ্রমকর্ম্মাপি" এবং "অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ" প্রভৃতি সূত্রে মহর্ষি ব্যাসদেব এই বৈদিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

যখন নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মকাণ্ডের পালন কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্থির হইল, তখন সগুণব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মোপাসকগণের তো কথাই নাই। লোক-শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীগণই প্রধান শিক্ষক। তাঁহাদের শিখি-বার কিছুই নাই। লোককে বিধি-বিহিতরূপে শিখাইবার বিস্তর আছে। সগুণব্রহ্মোপাসকগণ সেরূপ প্রধান পদের শিক্ষক নহেন। কেননা তাঁহাদের শিখিবার অনেক আছে।

যদি তাঁহাদিগকে শিক্ষক বলা যায়, তবে তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক মাত্র। তাঁহাদের কর্ত্তব্য কোনরূপ তর্ক বিতর্ক না করিয়া শ্রেষ্ঠদিগের পক্ষে ব্যবস্থাপিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন করেন। অর্থাৎ আপনারা কর্ম্মফলে আসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভারত সমাজের সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। ফলে শুদ্ধ শিক্ষা দিলেই চলিবে না। শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের শিক্ষা করিবার বিষয় বিস্তর আছে।—

> শারীরকে আছে (৩।৪।২৬) "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ"। গৃহ প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন অশ্বের প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যান্ত সেইরূপ যজ্ঞাদির প্রয়োজন। (৪।১।১৬) "অগ্নিহোত্রাদিতু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ"। সগুণব্রহ্মোপাসকেরা অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম করিবেন। তাহা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, এবং ক্রমে জ্ঞান লাভ হয়। যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সদ্গতি হয় এমত বেদে ও স্মৃতিতে আছে।

এস্থলে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, সগুণব্রহ্মোপাসকগণ কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। কেবল নিষ্কাম ভাবে ও ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি। যদি অন্তঃকরণ হইতে কামনা ত্যাগ না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে সাধক ব্রহ্মোপাসক হইতে পারেন নাই। যাঁহার হৃদয়ে কামনা নাই, তিনিই নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন। শুদ্ধ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলেই যে হইবে এমন নহে। কর্ম্মেতে যে ফল আছে, তাহা ব্রহ্মেতে অর্পণ করিতে হইবে। কর্ম্মানুষ্ঠান কালে ঈশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অনুভব করিতে হইবে। এমন ভাবে কর্ম্ম করিলে ব্রহ্মোপাসকের কর্ম্ম-যোগ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সাধিত হইবে। তাহা হইলে কর্ম্মফল, ঐহিক স্বার্থ, যশোলাভ, লোক-ভয় ও অনুরোধজনিত কোন বন্ধন ও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ

করিতে পারিবে না। ভারতীয় ধর্ম্মে স্থূলতঃ ফলের জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি। কিন্তু সূক্ষ্ম-তাৎপর্য্যে একমাত্র ব্রহ্মে-তেই সর্ব্ব কর্ম্মের উদ্দেশ্য। যাহার যেমন রুচি, অধিকার ও ধারণাশক্তি সে সেইরূপ করিতে পারে। যে ফল চায়, যশ চায়, ঐহিক অর্থ চায়, সে দূরে গিয়া পড়িল। যে ব্যক্তি কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্যে তাঁহাকে দেখে ও নমস্কার করে, সে অবিলম্বে তাঁহাকে পাইল। সে প্রাপ্তি সগুণ হইলেও সে ব্যক্তি ধন্য হইল। ক্রিয়াচরণজনিত কোন বন্ধন, পাপ, বা স্বার্থ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহার পরম লাভ হইল। এইরূপ লাভ হইতেই অন্তে নির্গুণ ভাবের উদয় হয়। গীতাতে কহিয়াছেন—

> যে ব্যক্তি ফলাভিসন্ধি ত্যাগ এবং ব্রহ্মেতে ফল সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ করে, সে ব্যক্তি কর্ম্মবন্ধনরূপ পাপেতে লিপ্ত হয় না। যেমন পদ্মপত্র জলেতে থাকি-য়াও জলে লিপ্ত হয় না। (৫।৯) জ্ঞানযোগে অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণেচ্ছু কর্ম্মফল-সন্ন্যাসী পুরুষের কর্ম্মই সোপান। যেহেতু তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। আর জ্ঞানযোগারূঢ় ব্রহ্মজ্ঞানির পক্ষে কর্ম্মত্যাগই জ্ঞান পরিপা-কের হেতু। কেননা কর্ম্ম সকল প্রায়ই তদবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপজনক হইয়া থাকে। (৬।৩) তথাপি "কর্ম্মজ্যায়ো-হ্যকর্ম্মণঃ"। সুপারগ হইলে কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। (৩।৮) একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা সেই পরম তত্ত্ব জানে না তাহারাই পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। (৯।২৪) কিন্তু "যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্যা-মিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে"। (ঐ স্বামী) যে ব্যক্তি সর্ব্বদেবতাতে একমাত্র ঈশ্বরকে অন্তর্যামি স্বরূপ দৃষ্টিপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। এইরূপ আচরণে কর্ম্মবন্ধন স্বরূপ শুভাশুভ ফল হইতে মুক্তিলাভ হয়। ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করায় সন্ন্যাসযোগ-রূপ ফল লাভ হয়। তাহাতে অন্তে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। (৯।২৮) জ্ঞানোৎপত্তি হইলেই কর্ম্মসন্ন্যাস

হইয়া থাকে। ফলের সহিত কর্ম্ম ত্যাগ করাকে পণ্ডিতেরা সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। কিন্তু বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা বলেন যে কর্ম্মের ফল মাত্র ত্যাগই ত্যাগ। কর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। (১৮।২) যজ্ঞ, দান, ও তপস্যাস্বরূপ কর্ম্ম সকল ত্যাজ্য নহে। বরং অবশ্যকর্ত্তব্য। কেননা মনীষি অর্থাৎ বিবেকিগণের পক্ষে সে সমস্ত কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকর। এই সকল কর্ম্ম সঙ্গত্যক্ত ও ফলকামনা রহিত হইয়া অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহাই শ্রেষ্ঠ মত। বিশেষতঃ নিত্যকর্ম্ম সকল কখনই ত্যাগ করা উচিত নহে। কেননা তাহা সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষের কারণ স্বরূপ হয়। যদি কেহ নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করে সে মোহজন্য। সে ত্যাগ তামসরূপে পরিকীর্ত্তিত হয়। যে ব্যক্তি মনে করেন আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তদ্ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল দুঃখজনক—অতএব কায়ক্লেশ ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাদৃশ ত্যাগ রাজস-ত্যাগ শব্দের বাচ্য। সেই রজোগুণান্বিত পুরুষ জ্ঞান-নিষ্ঠারূপ ত্যাগের ফল লাভ করিতে পারেন না। ফল ত্যাগ পূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্ম সকলের যে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ শূন্য অনুষ্ঠান তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। (১৮।৫—৯) অতএব সর্ব্ব কর্ম্ম বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মেতে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিবেক। (ঐ ৫৭) কেননা একমাত্র ব্রহ্মই সকল কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্যামী ও প্রভু। তাঁহার প্রতি ভক্তি এবং ফলাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করায় একমাত্র তাঁহারই পূজা করা হয় এবং কর্ম্ম জন্য পাপস্পর্শ হয় না। (৯।২৪ ও ৫।৯)

এইক্ষণে এই প্রকরণের সমাহার করা যাইতেছে। নির্গুণ বা সগুণ এই উভয় প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণই পাপাশঙ্কা বিহীন হইয়া ভারতীয় কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। তাহাতে ব্রহ্মোপাসকগণেরও উপকার আছে, সমাজেরও উপকার আছে। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলেই যে আমাদের নিস্তার আছে এমন নহে। কারণ একদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মগণ এবং অন্য দিকে চপলমতি নব্যগণ ভারতীয় কর্ম্মকাণ্ড ও হিন্দু আচার ব্যবহারের

প্রতিকূল। উহাঁরা সকলেই বিজাতীয় বিদ্যাতে সুপণ্ডিত, সুতরাং উহাঁদের চিত্ত ও চরিত্র, বুদ্ধি ও জ্ঞান বিজাতীয় উপাদানে বিরচিত। আক্ষেপের বিষয় এই যে উহাঁরা ভারতের সন্তান হইয়া ভারতীয় শাস্ত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত নহেন। এখন পরকীয়-বিদ্যা-সম্পাদ্য বুদ্ধি দ্বারা তাঁহারা ভারতের ধর্ম্মকে সংস্কার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়রূপ স্বতন্ত্র সমাজ ও তাহার নিমিত্ত বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি দুই চারিটী আবশ্যকীয় ক্রিয়ার স্বকপোলকল্পিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা মুখে শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্ম নাম বলেন মাত্র; কিন্তু তাঁহাদের আচরণ ও সাধন-প্রণালী প্রায়ই বিজাতীয়। মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসকদিগের নিমিত্তে যে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহাও দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এমন কি অনেক ব্রাহ্ম হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দ্বেষ বশতঃ উপনিষৎ ও অনুশাসন যুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ খানিও ত্যাগ করিয়াছেন। এতাদৃশ ব্রাহ্মগণ দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার অসম্ভব। তাঁহারা মনে করিতেছেন ক্রমে সকল হিন্দু আসিয়া ব্রাহ্ম হইবে। কিন্তু তাহা ভ্রম। কর্ম্ম, ব্রহ্ম, যোগ, ন্যায় ও বিদ্যাবিশিষ্ট সমগ্র হিন্দুসমাজ কখনই বিচলিত হইবে না। হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাসাগর হইতে প্রতিকূল-বায়ুবেগে দুই চারিটী বিন্দু ভ্রষ্ট ও উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু বায়ুর বেগ উপসংহৃত হইলে পশ্চাৎ সেই সাগরেই আসিয়া মিসিবে। কতিপয় ব্রাহ্ম বলেন যে হিন্দু-ক্রিয়া-কর্ম্মের আচরণ আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ। কিন্তু এ বালকের কথা। প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্ম কি তাহা বুঝিলে ইহা বলিতেন না। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মাভিমান রহিত হইলেও ইহা বলিতেন না, এবং তৃতীয়তঃ তাঁহা-

দের গুরু রামমোহন রায়ের শাস্ত্রীয় বিচার সকল বুঝিলেও ইহা বলিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাস, জনক, শৌনক, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা প্রভৃতি বড় বড় ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপাসকদিগের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ হয় নাই; কিন্তু এই বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মাভিমানী ব্যক্তিদিগের তাহা হইতেছে। তাঁহাদের কর্ত্তব্য অগ্রে বিশ্বাসের সংস্কার করেন। পশ্চাৎ যেন অভিনব অনুষ্ঠান পদ্ধতির অনুসরণ করেন। কেননা তাঁহাদের বিশ্বাস মহা রোগগ্রস্থ হইয়াছে। তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছে না। রোগারোগ্য না হইলে শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ পুষ্টিকর ভোগ্য সম্ভোগে তাঁহারা পারগ হইবেন না। অবশেষে এই বক্তব্য যে, যদি শাস্ত্রানুসারে বিচার করা যায়, তবে এইক্ষণকার অধিকাংশ ব্রাহ্মকেই সগুণব্রহ্মোপাসকও বলা যাইতে পারে না। নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞান তো তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর। মহাত্মা রামমোহন রায়ের শাস্ত্রসিদ্ধ নির্গুণোপদেশ সকল তাঁহাদের পক্ষে বৃথা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের দ্বারা শাস্ত্রানুসারে হিন্দুসমাজের রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি হওয়া সুদূর পরাহত। তাঁহারা জ্ঞান-ধর্ম্ম বলিয়া যাহা প্রচার করিতে ক্ষমবান তাহা ভারতের ধাতুর যোগ্য নহে।

অতঃপর ব্রাহ্মগণের অপেক্ষাও উর্দ্ধগামী আর এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহাদের তুলনায় ব্রাহ্মেরা আমাদের পরম আদরের পাত্র। কেননা ব্রাহ্মেরা অবৈধ অনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়াও ঈশ্বরের ভক্ত ও পরলোকবাদী। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তাঁহাদের অনেকের উৎসাহ আছে। তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলেও—তাঁহাদের হৃদয় পার্থিব ফলকামনা বিরহিত না

হইলেও—তাঁহারা এক প্রকার ভক্ত। সুতরাং তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ। কিন্তু এইক্ষণে আমরা যে সম্প্রদায়ের কথা তুলিতেছি, তাঁহারা ব্রাহ্মও নন, হিন্দুও নন, জ্ঞানীও নন, ভক্তও নন। তাঁহারা বিজাতীয় বিদ্যাতে সুপণ্ডিত, কিন্তু তাঁহাদের মতি চঞ্চল। তাঁহারা আপনাদের বিজাতীয় বুদ্ধির অনুযায়ী রূপে হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার ইচ্ছা করিতেছেন। বিজাতীয় বিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা তাঁহাদের জনকতক লোকের বুদ্ধি বিচলিত হওয়াতে তাঁহারা মনে করিতেছেন সমগ্র হিন্দুসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই স্বপ্নদৃষ্ট নবযুগের উপলক্ষে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিতেছেন। ফলে, এবিষয়ে তাঁহারা সংবাদপত্রেই আন্দোলন করুন, বক্তৃতা করিয়াই গগণভেদ করুন, আর আপনাদিগকে হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়াই ভাবুন, কিছুতেই তাঁহাদের আশা ফলবতী হইবে না। এখনও ভারত ভূমিতে ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান, সগুণোপাসনা, এবং সকাম-নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারই নাই। ফলে হিন্দুধর্ম্মে তাঁহারা কি পরিবর্ত্তন চান জানি না। বোধ হয় তাঁহারা উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান চান না, সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা চান না, নিষ্কাম ক্রিয়াযোগ চান না, যোগ সাধন চান না। কেননা সেই সকল তত্ত্ব যত হিন্দুধর্ম্মে এমন অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। বিশেষতঃ তাহা সপ্তমস্বরে বাঁধা আছে। সুতরাং সংস্কারায়ত্ত নহে। তবে তাঁহারা কি চান? তাঁহারা যদি ধর্ম্ম না চান, ভক্তি না চান, জ্ঞান না চান, তবে কি চান? তাঁহাদের দলভুক্ত একজনের লেখা পড়িয়া সংগ্রহ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা

একটা উদারভাবপূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম চান; যেরূপ ধর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন হইতে পারে, যাহাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে, যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হইতে পারে,এমন একটা উদারভাবপূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম চান। (নবজীবন পত্রিকা সংখ্যা ৩। ১২৯১। 'হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ' দ্রষ্টব্য) আমাদের বোধ হয় সাহেবদিগের ন্যায় পান, ভোজন, আচার-ব্যবহারকে হিন্দুসমাজে বিধিবদ্ধ করা তাঁহাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা; বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতা,আত্মাভিমান ও যথেচ্ছাচারকে তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মনে করেন; বোধ হয় বিজাতীয় বিদ্যাসম্পাদ্য চঞ্চলা বুদ্ধির ক্রীড়াকে তাঁহারা জ্ঞানের বিকাশ মনে করেন; যদি তাঁহারা এই সব উপাদান দ্বারা সংস্কৃত ও বিধিবদ্ধ একটা নবতর হিন্দুধর্ম্ম চান, তবে সে বিষয়ের উত্তর দানে অধ্যাপক ও ব্যবস্থাপকগণের আর হস্তক্ষেপ করার অপেক্ষা নাই। কারণ আমরাই সেই ব্যবস্থাপকগণের পক্ষ হইয়া উত্তর দিতেছি যে, পিতা মাতা যেমন অবাধ্য পুত্রের স্বেচ্ছাচার ও কুপথ্য ভোজনের প্রতিকূল, ভারতীয়-ধর্ম্ম ও ভারত-জননী সেই রূপ তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের প্রতিকূল। তাঁহাদের মত জন কতক লোককে স্পর্দ্ধা দিয়া হিন্দুধর্ম্ম আপনার চিরপ্রসিদ্ধ গৌরব হইতে পতিত হইতে পারেন না। কোন ব্যক্তি নিজে ম্লেচ্ছ হইয়া যদি সনাতন ধর্ম্ম-সেবী সাধুব্রত বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও ম্লেচ্ছ হইতে অনুরোধ করে তাহার যেমন দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়; হিন্দুধর্ম্মকে ও যাগ যজ্ঞ তপস্যা-পূত ভারতসমাজকে যাঁহারা স্বীয় অশাস্ত্রব্যবহারের অনুরূপ করিয়া পরিবর্ত্তিত করিতে চাহেন তাঁহাদেরও সেইরূপ বা তদপেক্ষাও স্পর্দ্ধা ও চপলতা প্রকাশ পায়। উপরে আমরা যাঁহার কতিপয় উক্তি

সংগ্রহ করিয়াছি তিনি লিখিয়াছেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম যদি সমগ্র হিন্দুসন্তানের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতে অক্ষম হন তবে "হিন্দুধর্ম্মের নিকট হইতে চির-বিদায় লইলে ভাল হয়"। এইরূপ আক্ষেপ ও ভয় প্রদর্শনে হিন্দুধর্ম্ম ও ভারত-সমাজ টলিবার নহেন। তাঁহার মত জন কতক লোক "সমগ্র-হিন্দু-সন্তান" শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। অতএব তাঁহারা বিদায় লইয়া গেলে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত সেবকের অভাব থাকিবে না। সাগর হইতে দশ পোনের কলশ জল উঠিয়া গেলে কি সাগরকে ন্যূন বোধ হয়? হিমালয় পর্ব্বত হইতে শত শত সকটভার প্রস্তর উঠিয়া গেলে কি তাহাতে কোন খর্ব্বতা লক্ষিত হয়? আকাশের দশ পাঁচটা তারা খসিয়া গেলে কি তারা অল্প দেখা যায়? সেইরূপ, যজাতির ম্লেচ্ছ-সন্তানগণের ভারত হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার ন্যায় ভারতের এই বর্ত্তমান কালীন কতিপয় নব্য যদি হিন্দুধর্ম্ম হইতে জন্মের মত বিদায় লন তবে হিন্দু-ধর্ম্মে এক তিল ন্যূনতাও লক্ষিত হইবে না। তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বিদায় গ্রহণ করুন, আমাদের তাহাতে দুঃখ নাই।

আমাদের বক্তব্য এই মাত্র যে যাঁহারা হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানীই হউন, সগুণ-ব্রহ্মোপাসকই হউন, ব্রাহ্মই হউন, থিওসফীষ্টই হউন, পিতৃতত্ত্ববাদীই হউন, আর বিজ্ঞানবাদীই হউন, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বংশের রীত্যনুসারে নিত্যনৈমিত্তিকাদি ভেদে ভারতবর্ষীয় সামাজিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই হইবে। বিচারালয়ে যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলেও সাক্ষী শপথরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠান পূর্ব্বক সাক্ষ্য প্রদান করে, সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকিলেও হিন্দুসমাজ-প্রচলিত কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতে হইবে। ইহাই বিধি। যাহা বিধি তাহা বুঝ বা না বুঝ রাজাজ্ঞার ন্যায় পালনীয়। তবে যদি অনুষ্ঠাতা ব্রহ্মজ্ঞানী হন, সগুণব্রহ্মোপাসক হন অথবা ভক্ত হন তাহা হইলে তিনি লোক শিক্ষার্থ, ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিপূর্ব্বক, সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠানে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্মরণ পূর্ব্বক, নিষ্কাম ভাবে ভক্তিপূর্ব্বক সেই সকল কর্ম্মাচরণ করিবেন। উচ্চ অধিকারীগণের পক্ষে এইরূপ আচরণই শাস্ত্রসিদ্ধ। কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞান, উপাসনা, ধ্যান, ধারণা, যোগ, সমাধি প্রভৃতি পরমাত্মীয় আলোচনা ও মানসিক ক্রিয়ার পক্ষে সময়াভাব ও বিক্ষেপ হয় এই ভয়ে যাঁহারা ঈশ্বরার্থে সর্ব্ব প্রকার অশ্রম ত্যাগের সহিত সর্ব্ব প্রকার আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তাঁহাদের সেরূপ ত্যাগ-জন্য কোন পাপ হয় না। কেননা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্বরূপ গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্‌পরিত্যজ্য মামেকংশরণংব্রজ। অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামিমাশুচঃ॥" বিধির দাসত্বরূপ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত সর্ব্ব কর্ম্মকাণ্ডে সন্ন্যাস পূর্ব্বক আমার অর্থাৎ এক মাত্র সর্ব্বাত্মা স্বরূপ, সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বরস্বরূপ, অচ্যুত, জন্মমরণাদিবর্জ্জিত আমার শরণাগত হও। এবম্প্রকারে আমার শরণাগত হইলে তোমার কর্ম্ম ত্যাগ নিমিত্ত কোন পাপ হইবে এমত শোচনা করিও না। কেননা আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মোক্ষ প্রদান করিব। (১৮।৬৬) বিশেষতঃ "যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে"। জ্ঞান যোগে আরূঢ় আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান চিত্তবিক্ষেপজনক। অতএব তাদৃশ জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম সকলের ত্যাগই পরম জ্ঞান পরিপাকের কারণরূপে উক্ত হইয়াছে। সেরূপ ত্যাগ অবৈধ নহে। (৬।৩)। শারীরকেও কহিয়াছেন "অন্তরাচাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ"। যদি কাহারো পক্ষে বর্ণাশ্রমাচার জ্ঞানসাধনের প্রতিবন্ধক হয় তবে তাদৃশ সাধকের পক্ষে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। (৩।৪।৩৬)

কিন্তু যাঁহারা হিন্দুসমাজের মধ্যগত তাঁহারা যে বর্ণাশ্রমাচার ও কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিবেন এমন উক্ত হয় নাই। অথবা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা যে ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম হইবে কিম্বা হইতে পারে সেরূপ আভাষ কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। সমাজবাসী ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মোপাসক, যোগাচারী প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উচ্চাধিকারীগণ যে, লোকশিক্ষার্থে, নিষ্কাম ভাবে, ও ঈশ্বরার্থে সামাজিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবেন ইহাই বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, গীতা, তন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভারতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি সমস্তই সেইরূপ পরমোপাদেয় ভাবে বিন্যস্ত হইয়া আছে। ফলকামী যজমান তাহার বহ্যিক ফলপুষ্প ভোগ করেন, কিন্তু উচ্চাধিকারিরা তাহার অভ্যন্তরগত অক্ষত, অমৃত, পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

---

# নবম অধ্যায়।

## কর্ম্ম ও ব্রহ্ম সমন্বয়।

"সর্ব্বেবেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি, যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যো-মিত্যেতৎ"। (কঠঃ শ্রু) সকল বেদ অর্থাৎ কি কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগ, কি জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সমূহ যে ব্রহ্মকে অবিভাগে প্রতিপাদন করেন; তপস্যারূপ যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, প্রভৃতি বৈধক্লেশজনক কর্ম্মকাণ্ড সকল যাঁহাকে কহেন; যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করেন, তিনি অধিকারী-ভেদে জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম ও ফলদাতা-স্বরূপ অপর ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। "তত্তু সমন্বয়াৎ" (শাঃ সূ) অতএব সমগ্র জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের তাৎপর্য্য এক মাত্র ব্রহ্মেতে। যেহেতু সমস্ত বেদই, সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মেতে সমন্বিত "তেষু সম্যগ্বর্ত্ত-মানো গচ্ছত্যমরলোকতাং। যথা সঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে"। (মনু ২।৫) ফলাভিলাষশূন্য হইয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ লাভ হয়। তথা, সগুণমুক্তির আনুসঙ্গিক অভিলাষ সকল এবং ব্রহ্মলোকাদিতে পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি দর্শনেচ্ছাও সফল হইয়া থাকে। "আত্মৈব দেবতাঃসর্ব্বা"। (মনু ১২।১১৯) এক যে পরমাত্মা তিনিই সকল-দেবতা। সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞোপাসনায় সেই পরমাত্মার দেবতারূপে অধিষ্ঠান শ্রুতিসিদ্ধ। 'একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ' (গীতা) জ্ঞান এবং কর্ম্মের একই অন্তিম উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন কখনই সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। এমন কি ব্রহ্মোপাসনা যাহা সগুণরূপে উক্ত হয় সমগ্র জন-সমাজ সে ব্রহ্মোপাসনারও অধিকারী নহে। ব্রহ্মোপাসনা যতই সগুণ হউক তাহা জনসমাজের ধারণার এবং বিশ্ববিদ্যা-

লয়ে অধ্যয়নের অতীত পদার্থ। কেননা তাহাতে জ্ঞান, প্রীতি, মানসিক-উপাসনা, বৈরাগ্য ও নির্গুণে আরোহণ-শক্তির প্রয়োজন। এমন উচ্চ-ধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহা বেদেরই অভিপ্রায়। ব্যাস (শাঃ সূঃ ৩।৪।৪৮) মীমাংসা করিয়াছেন "কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ" সমস্ত সমাজের প্রতি ব্রহ্মোপাসনার বিধি নহে। কেবল অধ্যয়নশীল উত্তম গৃহস্থ মাত্র তাহার অধিকারী। গুরু বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস ও ভক্তিশ্রদ্ধার আধিক্য হইলে উত্তম গৃহস্থ সকল ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী ও যতিস্বরূপ হন। ইতর গৃহস্থগণের সে শুভ অধিকার হয় না। সুতরাং এমন উন্নত ধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। তবে কি বেদের এই অভিপ্রায় যে, কেবল মাত্র নির্জ্জীব,বিধিপর,পদ্ধতিপর, হৃদয়শূন্য,স্বার্থপূর্ণ,হীন-ফলকামনা-যুক্ত,ঈশ্বরতত্ত্ববিরহিত, অচেতন কর্ম্মকাণ্ডই ভারতসমাজের ধর্ম্ম হইবে? কখনও নহে। যদিও মনু প্রভৃতি বিধি-প্রণেতাগণ এবং জৈমিনি অধিকাংশতঃ কেবল কর্ম্মপদ্ধতির কঠোর ব্যবস্থাপক ও বিচারক মাত্র ছিলেন। যদিও প্রধানতঃ জনসমাজকে সেই ব্যবস্থা দ্বারা বিধিপূর্ব্বক নিয়মিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। যদিও তাঁহারা জানিতেন ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা সমাজের বুদ্ধিভেদ করিলে তাহাদের কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে সমস্ত ভারতসমাজের অন্তরে ঈশ্বরবিশ্বাস। তাঁহারা জানিতেন সর্ব্ব দেবতাই একঈশ্বর স্বরূপ। তাঁহারা জানিতেন সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডই নানা দেবদেবীর নামাবলম্বিত হইলেও একঈশ্বরেরই উদ্দেশে। তাঁহারা জানিতেন যে জনসমাজের অন্তরে অন্তরে অলক্ষ্যভাবে এই সব বিশ্বাস ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহারা

বেশ জানিতেন যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মকে কহে—পরমাত্মাই অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি নামে সর্ব্বদেবতা। এবং তাঁহারা উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন যে এই সমস্ত ভাব বেদের এবং প্রজাদিগের অন্তরের সিদ্ধান্ত। অতএব লোক সকল বিধিপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে বলিয়া যে ঈশ্বরকে ত্যাগ করিবে বেদের এবং ঋষিদিগের এমন অভিপ্রায় নহে। তাহারা বিশুদ্ধভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণ করিতে পারুক বা নাই পারুক; যজ্ঞীয় দেবতার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক; কিন্তু শিব-রহিত যজ্ঞে দক্ষের ন্যায় তাহাদের অধোগতি না হয়, এই জন্য তাহাদের অনুষ্ঠিত সমস্ত ক্রিয়ার ফল ঈশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার নিমিত্তে সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে আদেশ দিয়াছেন।

মনু (১২।৯২) কহিয়াছেন "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্" ॥ বরং শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়সংযমে, এবং প্রণবোপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। মনুর টীকাকার কুল্লুক ভট্ট এই বচনের টীকায় বিশদরূপ লিখিয়াছেন "এতচ্চৈষাং মোক্ষোপায়ান্তরঙ্গোপায়ত্ব-প্রদর্শনার্থং নত্বগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগপরতয়েত্যুক্তং"। এই বচনটী মোক্ষের অন্তরঙ্গ উপায় প্রদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে। নতুবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগার্থ নহে। ফলে মনু বাহুল্যরূপে ক্রিয়াবিধির প্রণেতা হইয়াও কর্ম্মকাণ্ডের অপেক্ষা আত্মজ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি একদিকে "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বা" ও "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং" প্রভৃতি শ্লোকে যেমন ব্রহ্মকেই সর্ব্বদেবতারূপী কহিয়াছেন, সেইরূপ অন্য-

দিকে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের ন্যায় অনেক বচনে জ্ঞানীগণের প্রতি নিষ্কামভাবে ও আত্মজ্ঞানের সহকারিতায় কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা উপদেশ দিয়াছেন।

"কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা। কাম্যোহি বৈদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চবৈদিকঃ" ॥ স্বর্গাদি ফলাভিলাষ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান গর্হিত, কেননা তাহাতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান সহকারে বেদবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥ (২।২) "সর্ব্বেষামপিচৈতেষা মাত্মজ্ঞানংপরংস্মৃতং। তদ্ধগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতেহ্যমৃতংততঃ ॥" বেদাভ্যাসাদি সর্ব্ব কর্ম্মাপেক্ষা উপনিষদুক্ত পরমাত্মজ্ঞান প্রকৃষ্ট। কেননা তাহা হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ হয়। (১২।৮৫) "সর্ব্বভূতেষুচাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি। সমংপশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥" সর্ব্বভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত এইরূপ জ্ঞানে যাহারা ব্রহ্মার্পণ-ন্যায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহারা মোক্ষ লাভ করে। (মনু ১২।৯১)

এই প্রকার বিস্তর বচন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মনু বিধি-প্রণেতা হইয়াও জ্ঞান-সাধনের উপদেশ করিয়াছেন। এবং, পরব্রহ্মেতে সমস্ত কর্ম্ম-ফল অর্পণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় কর্ম্মকাণ্ড অচেতন ও নির্জ্জীব নহে। তাহাতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আছে। ইহা যাঁহারা বুঝিতে অপারক তাঁহাদিগকেও অনুষ্ঠিত কর্ম্মফল শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হইবে। ইহাই সামাজিক বিধি। উন্নত-ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা—সাংখ্যজ্ঞান ও যোগ-সাধন সামাজিক ধর্ম্ম না হইলেও ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মরূপ কর্ম্মকাণ্ড সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট। ফলকামী যজমান আপাততঃ সেই পরমোদ্দেশ্য অনুভব করিতে অপারক হইলেও তাঁহার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ ক্রমে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া অন্তে তাঁহাকে সেই উদ্দিষ্ট ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত করিবেই।

মহর্ষি জৈমিনিও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের পদ্ধতি ও বিধিমাত্রের বিচারক হইয়াও জ্ঞান-ভাগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। যথা "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বাম্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ"। কর্ম্ম ও দেব-প্রতিপাদক গৌণশ্রুতি এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদক মুখ্যশ্রুতি এই উভয়ের বিরোধস্থলে কেবল মুখ্যেরই সহিত বেদের সম্বন্ধ মানিতে হইবে। মহর্ষি জৈমিনির এই সূত্রানুসারে ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের সংযোগ স্বীকার করিতে হইবে। যদিও কর্ম্মীগণের অধিকার দৃষ্টিতে মহর্ষি জৈমিনি কেবল মাত্র ধর্ম্মকেই ফলদাতা কহিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম গৌণ-পদার্থ মাত্র। ঈশ্বরই মুখ্যফলদাতা।

মনু ও জৈমিনি উভয়েরই শাস্ত্র কেবল ক্রিয়া-প্রয়োজক। কিন্তু তাঁহারা কেহই ঈশ্বর বিহীন ক্রিয়ার উপদেশক ছিলেননা। ক্রিয়া-পদ্ধতি দ্বারা ভারতসমাজকে নিয়মিত করা তাঁহাদের এবং অন্যান্য স্মৃতিকারগণের উদ্দেশ্য ছিল বটে। অপিচ তাঁহারা ইহাও জ্ঞাত ছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে ব্রহ্মরহিত কর্ম্মকাণ্ডকে ভারতের সামাজিক ধর্ম্মরূপে স্থাপন করিয়াছেন এমন নহে। তাঁহাদের কৃত ক্রিয়াপদ্ধতিতে প্রজাগণের ফলকামনা ও ঈশ্বর-প্রীতি এই উভয় ভাবই চরিতার্থ হওয়ার উপায় আছে। যিনি যাহা চান তিনি তাহা পান। ফলতঃ এবিষয়ে তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের কর্ম্মকাণ্ড এখনও সহস্র হস্ত তুলিয়া সহস্র দিকে সহস্ররূপে সেই এক অরূপী যজ্ঞপুরুষকে দেখাইতেছে। কর্ম্মকাণ্ড যাঁহাকে এইরূপে তটস্থ লক্ষণে নির্দ্দেশ করে,জ্ঞানকাণ্ড তাঁহাকেই জ্ঞানীজনের নির্ম্মল হৃদয়ে স্বরূপতঃ প্রকাশ করিয়া থাকে।

যখন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণই সর্ব্ব কর্ম্মকাণ্ড ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসক মহর্ষি ব্যাসের তো কথাই নাই। কেননা ব্রহ্মই তাঁহার মুখ্য বিচার্য্য এবং সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডের প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার প্রধান ব্রত।

মহর্ষি ব্যাস সমগ্র বেদের জীবন্ত তাৎপর্য্য এবং প্রজাপণের অন্তরের উদ্দেশ্য যুগপৎ লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন সমস্ত বেদ যে পরমেশ্বরকে প্রতিপাদন করে তাঁহাকে না জানিয়াও তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তে লোক সকল লালায়িত রহিয়াছে। অতএব তিনি "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রদ্বারা এই বেদ-বিচার করিলেন যে, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সমগ্র বেদই ব্রহ্মের জ্ঞাপক। তিনি কহিলেন "অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্ম ব্যপদেশাৎ" (শাঃ সূঃ ১।২।১৮) অধিদৈবাদি দেব-প্রতিপাদক বেদবাণী সকল সর্ব্বদেবতাতে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। অতএব ব্রহ্মই সর্ব্বদেবতা। 'অনেন সর্ব্বগতত্ব মায়াশব্দেভ্যঃ' (ঐ ৩।২।৩৭) সর্ব্বগতরূপে সর্ব্বদেবে ব্রহ্মেরই প্রকৃত দেবত্ব। দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মায়িক মাত্র। "সর্ব্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ" (ঐ ৩।৫।২৬) চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবেক। তাহাতে ক্রমে ব্রহ্মনিষ্ঠা উদিত হয়। "বিধির্ব্বাধারণবৎ" (ঐ ৩।৫।১৯) বেদে কর্ম্ম করারও উপদেশ আছে, কর্ম্ম ত্যাগেরও বিধি আছে। ইহার সামঞ্জস্য এই যে ফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে ক্রিয়া করিবেক। এসম্বন্ধে ব্যাসকৃত ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদরূপ ভগবদ্-

গীতা শাস্ত্রে বিস্তীর্ণ উপদেশ আছে। তাহার কতিপয় বাক্য আমরা ইতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

এইরূপে মহর্ষি ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্মোপাসনার সহিত সমন্বয় করিয়াছেন। এ সমন্বয় বেদ, স্মৃতি, কর্ম্মমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত। ইহা জ্ঞানী, ব্রহ্মোপাসক, কর্ম্মী, বিদ্বান্, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সর্ব্ব প্রকার লোকের অধিকারেই সংলগ্ন হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের তো কথাই নাই। শূদ্রাদিও ইহার অধিকারী। বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পক্ষে কোন্ জাতির কতদূর অধিকার মনুই তাহার বিচারক ও মীমাংসক। যদিও দশ-সংস্কার-বর্জ্জিত শূদ্রাদির পক্ষে মানব-শাস্ত্রের অধ্যয়নে ও ব্যবসায় মনু অধিকার দেন নাই, কিন্তু তাহারা যে মানব-ধর্ম্মোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না, এমন উক্ত হয় নাই। বরং মনুর টীকাকার কুল্লূক ভট্ট (২।১৬) স্পষ্টই লিখিয়াছেন "এতচ্ছাস্ত্রানুষ্ঠানঞ্চ যথাধিকারং সর্ব্বৈরেবকর্ত্তব্যং ইত্যাদি"। এই মানব-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে শূদ্রাদি সর্ব্ববর্ণের অধিকার আছে। সুতরাং ভারতীয় বেদস্মৃত্যাগমবিহিত সামাজিকধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার লোকের সাধনীয় এবং সকলেরই অধিকার ও ধারণাশক্তির উপযুক্ত।

ব্রহ্মোদ্দিষ্ট নিত্য, নৈমিত্তিক, দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম সমুদয়ই ভারতের সামাজিকধর্ম্ম। তাহারই সামাজিকতার প্রতি বেদের উদ্দেশ্য। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি নির্লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে ও লোকশিক্ষার্থে সমস্ত ক্রিয়া করিবেন। যিনি ব্রহ্মোপাসক তিনিও ফলকামনা শূন্য হইয়া সেই সমস্ত কর্ম্ম পরব্রহ্মেতে অর্পণ করিবেন এবং সর্ব্বযজ্ঞে তাঁহার অধিষ্ঠান স্মরণ করিবেন। যিনি কর্ম্মী তিনি যতদূর পারেন সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা শ্রীহরিকে

স্মরণ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন এবং যতদূর ক্ষমবান হন ক্রমে অনিত্য ফলের পরিবর্ত্তে স্বীয় ভগবৎ লাভের সত্ত্বাধিকারকে সফল করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা নিতান্ত দুর্ব্বলাধিকারী, যাঁহাদের চিত্ত ফলনিমিত্ত লালায়িত, যাঁহারা সদাই যশ ও কীর্ত্তির জন্য ব্যস্ত, চাঞ্চল্য বশতঃ—সংসাররূপ বিক্ষেপ বশতঃ—যাঁহাদের অন্তরে ঈশ্বর-ভক্তি স্থান পায় না, তাঁহারাও ঐ সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবেন। কেননা কর্ম্মানুষ্ঠানই একদিকে ভারতসমাজের বন্ধন এবং অন্য দিকে ক্রমকল্যাণদায়ক। তাঁহারা বিধি ও পদ্ধতি পালনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে—ফলকামনার সহিত ক্রিয়া সাধন করিতে করিতে—অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম কল্যাণ লাভ করিবেন।

এইরূপে বাহ্যেতে সকল অধিকারী ও সকল বর্ণই শ্রুতি, স্মৃতি, আগম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি সামাজিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু অন্তরে যাঁহার যেমন অধিকার তিনি সেইরূপ অপ্রতীক বা প্রতীক বুদ্ধিতে, নির্লিপ্তভাবে, নিষ্কামচিত্তে, ব্রহ্মার্পিতরূপে, লোকশিক্ষার্থে, ব্রহ্মাধিষ্ঠান স্মরণ পূর্ব্বক, ভগবদ্ভক্তি সহকারে অথবা ফলকামনার সহিত, কিম্বা বংশের আচার ও কীর্ত্তি রক্ষার নিমিত্ত বা লোকরঞ্জনার্থ ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। এইরূপ আচরণ দ্বারা মূলতঃ কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সকলের, ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের ও জৈমিনি-প্রণীত কর্ম্মমীমাংসার অভিপ্রেত সামাজিক বিধিপর-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার সহিত বিস্তীর্ণ ভারতসমাজের একতা রক্ষা পাইবে এবং অধিকন্তু সর্ব্ব শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত স্বরূপ নিষ্কাম ও অপ্রতীক উপাসনা দ্বারা উচ্চাধিকারীগণেরও

পরম মঙ্গল হইবে। ভারতীয় এই সামাজিক ধর্ম্ম সর্ব্ববেদ, সর্ব্বস্মৃতি, সর্ব্বদর্শন, সর্ব্বপুরাণ ও সর্ব্বতন্ত্র বিহিত। এই বর্ত্তমান কালে যাঁহারা এই প্রকাণ্ড ধর্ম্মকে আঘাৎ বা অঙ্গহীন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের বুদ্ধি অতি জঞ্জালগ্রস্ত। এই ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের মূল, স্কন্ধ, শাখাপ্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতিকে ধীর হইয়া অনুধ্যান করিলে ইহার আশ্রয় ত্যাগে কাহারই ইচ্ছা হইবে না। দূরগামী ব্রাহ্মেরা ও সমাজসংস্কারেচ্ছু অন্যান্য নব্যেরা ক্ষণকাল ধীর হইয়া দণ্ডায়মান হউন, ক্ষণকাল বক্তৃতায়, ও সংবাদপত্রে আন্দোলনে ক্ষান্ত হউন, ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধরিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম-কল্পবৃক্ষকে পাঠ করুন, দেখিবেন বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপত্তি হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব-অজ্ঞতাকে সপ্রমাণ করিবে।

---

# দশম অধ্যায়।

## দেব-সমন্বয়।

গীতাশাস্ত্রে (৭।২১—২২) শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন।" যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্যতস্যাচলাং-শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥ সতয়াশ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধন-মীহতে। লভতে চ ততঃকামান্ মর্য়ৈববিহিতান্‌হিতান্॥ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত আমার (পরমেশ্বরের) মূর্ত্তিবিশেষ কোন দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন আমি সেই সকল ভক্তের শ্রদ্ধাকে অন্তর্যামিরূপে দৃঢ় করিয়া দেই। তাহাতে তাদৃশ ভক্তেরা দৃঢ়তর শ্রদ্ধাদ্বারা সেই সকল দেব-মূর্ত্তির আরাধনা করেন। তদ্দ্বারা অভিলষিত যে সমস্ত ফললাভ করেন সে সমস্ত ফল আমা কর্ত্তৃকই বিহিত। কেননা সেই সকল দেবতা মৎস্বরূপ মাত্র। অপিচ (৯।২৬) "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমেভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ।" যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে কেবল পত্র, পুষ্প, ফল, জল দিয়া পূজা করে, আমি সেই প্রযতাত্মা ব্যক্তির নিবেদিত পত্র পুষ্পাদি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করি। অপরঞ্চ (ঐ ৩২) মাংহি পার্থব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃপাপযোনয়ঃ। স্ত্রীয়োবৈশ্যা-স্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তিপরাং গতিং।" নিকৃষ্ট কুলোদ্ভব চণ্ডালাদিই হউক, কেবল কৃষ্যাদি কর্ম্মেরত বৈশ্যাদিই হউক এবং অধ্যয়নাদি রহিত স্ত্রী শূদ্রাদিই হউক যে কেহ আমার সেবা করিবে সে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবে। তাৎপর্য্য এই যে যাগযজ্ঞ ও মানসিক ভক্তি-সহকারে ঈশ্বরের পূজায় সকলেরই অধিকার আছে।

যদিও ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনে বা বেদবিহিত অপ্রতীক ব্রহ্মো-পাসনায় সকলের অধিকার নাই কিন্তু ভারতবর্ষীয় সামাজিক ধর্ম্মরূপ দেবার্চ্চনাদিতে সর্ব্ববর্ণীয় স্ত্রী পুরুষের অধিকার আছে।

ফলে ইহা কদাপি মনে করা কর্ত্তব্য নহে যে দেবতারা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র। সমস্ত দেবগণই ব্রহ্মস্বরূপ। অথচ তাঁহাদের পূজায় সাধারণের অধিকার।—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে যিনি ভগবানকে যে নামে ডাকুন—ব্রহ্মই বলুন, ঈশ্বরই বলুন, দুর্গাই বলুন, আর কৃষ্ণই বলুন, তাঁহার তাহাতেই ত্রাণ। কেননা ব্রহ্মেতেই সকল পূজার ও সকল তপস্যার উদ্দেশ্য। বেদে কহিলেন "সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসিসর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি, যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি, তত্তেপদংসংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।" (কঠ ২।১৫) সমস্ত বেদ অবিভাগে যে পদকে প্রতিপাদন করে, সমস্ত তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে তিনি ব্রহ্ম—ইহাই সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত। মহর্ষি ব্যাসদেব শারীরক সূত্রে ঐ শ্রুতির মীমাংসা করিলেন 'তত্তু সমন্বয়াৎ' ব্রহ্মেতেই সকলবেদের সমন্বয়। শঙ্করভাষ্য এবং ভারতীতীর্থ মুনির সিদ্ধান্তানুসারে রামমোহন রায় উহার অর্থ করিলেন "ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। সর্ব্বেবেদাযৎপদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান, যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়, পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে"। ব্যাসদেব বেদান্তশাস্ত্রে আরো মীমাংসা করিলেন "সর্ব্বেবেদান্তপ্রত্যয়ঞ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ"। "সলিলবচ্চতন্নিয়মঃ"। আচার্য্য অর্থ করিলেন "নশাখাভেদাদুপাসনংভিদ্যতে।" রামমোহন রায় এই সকল সূত্রের ভাষা করি-

লেন যে "উপাসনা পৃথক্ পৃথক্ হয় এমত নহে। সকল বেদের নির্ণয়রূপ যে উপাসনা সে এক হয়; যেহেতু বেদে কেবল এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে। আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি সংজ্ঞার অভেদ হয়। যদি কহ এক শাখাতে আত্মার উপাসনা করিতে বেদে কহিয়াছেন, দ্বিতীয় শাখাতে কৃষ্ণকে, তৃতীয় শাখাতে রুদ্রকে উপাসনা করিতে বেদে কহেন, অতএব এই ভেদকথনের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয় এমত নহে। * * নামের ভেদে উপাসনার এবং উপাস্যের ভেদ হয় না। * * * সমুদ্রেতে যেমন সকল জল প্রবেশ করে, সেইরূপ সকল উপাসনার তাৎপর্য্য ঈশ্বরে হয়"। মহর্ষি ব্যাস আরো মীমাংসা করিলেন "নানাশব্দাদিভেদাৎ" "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ" আখ্যান, দৃষ্টান্ত ও প্রকরণ প্রভৃতি বিদ্যার ভেদ ও বহু উপাসনার ব্যবস্থা বেদে থাকিলেও উপাসনার প্রয়োজন যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার তাহা কোন একটি উপাসনাতেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং তাহা সিদ্ধ হইলে আর আর উপাসনা ব্যর্থ হয়। অতএব যে কোন নামের অবলম্বনে উপাসনা করিলেই সিদ্ধি হইতে পারে। মনু স্মৃতিতে কহিলেন "আত্মৈবদেবতাঃসর্ব্বাঃ" পরমাত্মাই ইন্দ্রাদি সকল দেবতা জানিবে। "এতামেকেবদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যেপ্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতং"। এই পরমাত্মাকে কেহ অগ্নিরূপে উপাসনা করে, কেহ বা মনু নামক প্রজাপতি ভাবিয়া উপাসনা করে, কেহবা ইন্দ্ররূপে, কেহ প্রাণরূপে, অপর কেহ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সনাতন ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে। গীতাস্মৃতিতে কহিলেন "জ্ঞান যজ্ঞেনচাপ্যন্যে যজন্তোমামুপাসতে। একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধাবিশ্বতোমুখং" সর্ব্বাত্মদর্শনরূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আ-

মাকে কেহ কেহ উপাসনা করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অহঙ্কার শূন্য অভেদ ভাবনায়, কেহবা আমি ভগবানের দাস এইরূপ পৃথক ভাবনায় আমার পূজা করিয়া থাকেন, অথবা আদিত্য চন্দ্রাদিভেদে বা বিশ্বরূপে বহু প্রকারে আমারই আরাধনা করেন। "যেহপ্যন্যদেবতাভক্ত যজন্তেশ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ। নতুমামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তিতে॥" যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাকে আমা হইতে পৃথক ভাবিয়া পূজা করে তাহারাও প্রকারন্তরে আমারি উপাসনা করে। কিন্তু তাহারা ফলাসক্তি সহকারে মোক্ষপ্রদ বিধির অন্যথায় পূজা করাতে পুনরায় সংসারগতি প্রাপ্ত হয় এইমাত্র প্রভেদ। নতুবা আমিই দেবতারূপে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভুস্থানীয় অর্থাৎ ফলদাতা, কিন্তু এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানে তাহারা আমাকে জানেনা বলিয়া তাহাদের ইষ্ট যে যাগফল তাহাই ভোগ করিবার নিমিত্তে পুনরায় সংসারগতি লাভ করে। কিন্তু (স্বামী) "যেতু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে" সর্ব্বদেবতাতে আমাকে অন্তর্যামী স্বরূপ দৃষ্টি করিয়া যে ব্যক্তি অর্চ্চনা করে তাহার আর সংসার-গতি প্রাপ্তি হয় না। তন্ত্রে কহিলেন "যথাগচ্ছন্তি সরিতোহ-বশেনাপিসরিৎপতিম্। তথার্চ্চাদীনিকর্ম্মাণি তদুদ্দেশ্যানি-পার্ব্বতী"। যেমন নদীসকল স্বভাবতঃ সাগরে গমন করে, তদ্রূপ পূজা অর্চ্চা সকল ব্রহ্মেরই উদ্দেশে আচরিত হয়। পুষ্প-দন্ত গন্ধর্ব্বরাজ মহাদেবের স্তবে কহিলেন। "ত্রয়ীসাংখ্যংযোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি, প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্য-মিতিচ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং, নৃণামে-

কোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব"। "বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, পশুপতিমত, বৈষ্ণবশাস্ত্র, এই সকল নানা শাস্ত্র ও মত এক স্থানে গমনের নানা পথের ন্যায় লোকের অভিরুচির ভিন্নতা হেতুক বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু হে মহাদেব! যেমন নানা দেশের নদী সকল সাগরে সঙ্গমিত হয়, সেইরূপ উক্ত ঋজুকুটিল নানা পথগামী নরগণের পক্ষে আপনিই একমাত্র গম্যস্থান। বতা সর্ব্ব প্রকার দেবার্চ্চনাই ব্রহ্মেতে সমন্বিত। মানবের উপাসনা-প্রবৃত্তি সেই একই দেবকে অভিনন্দন করে। নাম ও পদ্ধতির ভেদে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের অন্যথা, বিকৃতি বা নানাত্ব সংঘটিত হয় না। তবে উপাসনার লঘুত্ব ও গুরুত্ব, গৌণত্ব ও মুখ্যত্ব, অদৃঢ়ত্ব ও দৃঢ়ত্ব, ইত্যাদি ইতর বিশেষ অনুসারে অল্প বা অধিক ফল হইয়া থাকে এইমাত্র। শাস্ত্রে নাম, শাখা বা পদ্ধতি বিশেষের কোন আদর নাই, অপেক্ষাও নাই, উপেক্ষাও নাই। শাস্ত্র কেবল উপাসকের মনের ভাব লইয়া বিচার করেন। কে কি ভাবে ও কি অভিপ্রায়ে উপাসনা করিতেছে তিনি তাহাই দেখেন। কিন্তু উপাসক যে কোন নামাবলম্বনে পূজা করুন তাহা যে ব্রহ্মেরই পূজা, শাস্ত্র তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শাস্ত্র বিশেষ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও সর্ব্ব প্রকার প্রার্থনার ফলদাতা সুতরাং সে বিষয়ে শাস্ত্র হস্তক্ষেপ করেন না। কেবল উপাসকদিগের উপাসনার প্রকার ও প্রার্থনার অভিপ্রায় দেখিয়া সেই অভিপ্রায় সমূহের উচ্চতা বা নীচতা অনুসারে উপাসনার মুখ্যত্ব ও গৌণত্ব স্থির করেন। এইরূপ মুখ্যত্ব ও গৌণত্বের যতই শ্রেণী বা প্রকারভেদ থাকুক, কিন্তু সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রানুসারে পন্থা দুইটী ভিন্ন নাহি। তন্মধ্যে যেটি কনিষ্ঠ তাহার

নাম প্রবৃত্তি-মার্গ এবং জ্যেষ্ঠের নাম নিবৃত্তি-মার্গ। প্রথমটির দ্বারা ঈশ্বরের নিকট হইতে ফল পাওয়া যায়, আর দ্বিতীয় পন্থা আশ্রয় করিলে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপ মোক্ষলাভ হয়। যাঁহারা বিষয়-বাসনায় ও সুখের কামনায় অস্থির, তাঁহারাই কনিষ্ঠ পথের পথিক, আর যাঁহারা তাদৃশ বাসনাত্যাগী তাঁহারাই মোক্ষপথাবলম্বী। বাসনাতে বদ্ধ হইয়া কাম্যবস্তুর প্রার্থনা সহকারে ব্রহ্ম-নামের উপাসনা করাও নিকৃষ্ট। আর সংসার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কালিকৃষ্ণ প্রভৃতি কোন নাম অবলম্বনে তাঁহার চরণ লাভার্থে উপা-সনা করাও উৎকৃষ্ট। নামে "ব্রহ্মোপাসনা" করিলেই সিদ্ধি হয় না। অহঙ্কার ও বাসনা ত্যাগই সার। পরমেশ্বরের শ্রীচরণ কামনাই মুমুক্ষুত্ব। অতএব কামনার সহিত ব্রহ্ম বা কালিকৃষ্ণ যে কোন নামাবলম্বনে উপাসনা হউক তাহা কেবল গৌণ-উপাসনা মাত্র এবং অনিত্য-ফলের নিমিত্তে। তাদৃশ ব্রহ্ম নাম বা কালিকৃষ্ণ নামে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। উভয় প্রকার নামাবলম্বিত উপাসনাই সংসার-বন্ধনের সৃঙ্খল স্বরূপ। আর ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মুক্তির নিমিত্তে পরমাত্মার বা যে কোন নাম ধরিয়া আরাধনা হউক তাহাও ব্রহ্মোপাসনা বা অপ্রতীক উপাসনা শব্দের বাচ্য। তাহাই মুখ্যপথ এবং নিবৃত্তিধর্ম্ম। অতএব নামের ভেদে উপাসনার ভেদ হয় না। ফল-বাসনাবিরহিত, কেবলমাত্র ভগবানের পদারবিন্দ বাঞ্ছিত যে অহৈতুকী উপাসনা তাহাই ব্রহ্মোপাসনা ও অপ্রতীকোপাসনা শব্দের বাচ্য। নিরাকার ব্রহ্ম-পক্ষে বা সাকার দেব-পক্ষে তাহার ভেদ হয় না। কেননা তাদৃশ অবস্থায় সর্ব্বত্র জীবের ব্রহ্মদর্শন ও অপ্রতীক-সাধন স্থিরীকৃত হয়।

এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান ও অভেদজ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান। যাঁহাদের তাদৃশ জ্ঞান জন্মে, তাঁহারা যুগপৎ ভক্তও বটেন, সন্ন্যাসীও বটেন। তাঁহারা রূপ নাম নির্দ্দেশ বিশেষণ লইয়া বিবাদ করেন না; কেবল ভগবানের আনন্দে নিমগ্ন হওত তাঁহার সহিত একাত্ম অথবা তাঁহার দাস্যকর্ম্মে ব্রতী হইয়া যান এইরূপ ব্রহ্ম উপাসনাই ফলপ্রদ ব্রহ্ম বা দেবারাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ। নতুবা আমি নামে আপনাকে ব্রহ্মোপাসক বলিয়া পরিচয় দিলাম, কিন্তু হৃদয়ে রাজ্য ধন ধান্য পুত্র আয়ু যশঃ প্রভৃতির অপার বাসনা বিরাজিত। আমি ব্রহ্মোপাসকগণের শাসনভয়ে প্রকাশ্যে সে সকল ফল ব্রহ্মের নিকটে চাহি না বটে, কিন্তু আমার মন তজ্জন্য তাঁহাকে উদ্বোধিত করিতে ক্ষান্ত নহে। আমার সে প্রকার উপাসনা শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত ফলপ্রদা লক্ষ্মী বা ষষ্ঠীপূজা হইতে একতিলও শ্রেষ্ঠ নহে। উভয়ের মধ্যে কেবল এইমাত্র প্রভেদ থাকে যে, প্রথমতঃ সামাজিক উপাসনার নিমিত্তে সনাতন হইতে ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধাধীন ভগবানের যে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে, সেই ব্যবস্থার অন্যথা হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী হইতে উচ্চতম স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত বিষয়ানন্দে বৈরাগ্য জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মোপাসকের নিমিত্তে যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব "ব্রহ্ম" অবশিষ্ট থাকেন, শাস্ত্রে এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে যে অবস্থায় ভগবানের "ব্রহ্ম" নাম প্রসিদ্ধ আছে, সেই নাম অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অনিত্যবিষয় প্রার্থনা করায় শাস্ত্রের অপমান করা হয়। "ব্রহ্মোপাসক" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর বাসনা, পূজাকালে প্রকাশ না করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিলেও ঐ দোষে পরিহার হয় না। কিন্তু "সলিলবচ্চতম্মিয়মঃ" সাগরে যেমন

সকল নদনদী প্রবেশ করে, সর্ব্বপ্রকার অর্চ্চনা সেইরূপ একই ভগবানের উদ্দেশে; এই শাস্ত্রার্থ স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বদেবে ও সর্ব্ব কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বকবিষয়-বৈরাগ্য প্রভৃতি মোক্ষ-প্রদ বিধি অনুসারে তাঁহার যে পূজা আচরিত হয় তাহাতে উপরি উক্ত ব্যবস্থাভঙ্গরূপ দোষদ্বয় অর্শে না। কেননা বেদান্ত-শাস্ত্রে নিয়ম করিয়াছেন "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ"। (৪।১।৫) পূর্ব্ব-কালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে ফল-প্রার্থনাতে "ব্রহ্ম" নামকেই কেন অবলম্বন করা না যায়? তাহাতে মহর্ষি ব্যাসদেব উক্ত সূত্রে মীমাংসা করিয়াছেন যে নিকৃষ্ট পদার্থেতেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টি কর্ত্তব্য। যথা রাজার মন্ত্রিকে রাজা বলিয়া সম্বোধনাদি করিতে পারে কিন্তু রাজাকে মন্ত্রী জ্ঞান করিতে পারে না। যদিও "লক্ষ্মী" ষষ্ঠী প্রভৃতি নামে ব্রহ্মের "ফলদাতৃত্ব" প্রসিদ্ধই আছে তথাপি বাসনা ক্ষয় হইলেই তাদৃশ প্রসিদ্ধ-ফলদাতা দেবদেবী-তেও "মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মদৃষ্টি" করিতে পারে, কিন্তু সামাজিক-উপাসনা বা কাম্য-উপাসনাতে "ব্রহ্মনাম" অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত নহে। হৃদয়ে ফলকামনা সত্ত্বেও বাহ্যতঃ অনেকে এই শাস্ত্রীয় যুক্তির মর্ম্ম অনুসারে পরমেশ্বরের উপাসনা সময়ে কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন; অথবা তাঁহাকে পাইবার অনুকূল "অনুবন্ধ" কি না প্রীতি ও তাদ্বিধ্য" কি না প্রিয়কার্য্য ভিক্ষা করিয়া থাকেন। কেননা তাঁহাদের জানা আছে যে, তাঁহাকে লাভ করা সাংসারিক ফলের ন্যায় অনিত্য নহে, তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যও সংসারীয় স্বার্থ নহে। কিন্তু পরমে-শ্বরে প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য করিতে গিয়া যদি কেহ অক্ষুণ্নচিত্তে এমন মনে করিতে পারেন যে আমি কেবল পরমেশ্বরেরই দাস্যকর্ম্ম করিতেছি, তখন তাঁহার আর নিজের কোন স্বতন্ত্র

স্বার্থ থাকেনা। এই প্রকার ভাবই উৎকৃষ্ট, কিন্তু কয়জন তাহার যোগ্য? হয়ত সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত কেহ সেরূপ উপাসনা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তাহার কারণ এই যে; বাসনা ও স্বার্থ-ভরা হৃদয় ফলকেই অভিনন্দন করিবে, আপনারই প্রিয়কার্য্য করিবে, ব্রহ্মকেও চাহিবে না, তাঁহার "প্রিয়কার্য্য" নামক নিষ্কামকর্ম্মও করিবে না। অতএব কিছুতেই ব্রহ্মোপাসনা সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। নানা দেবদেবির রূপ-নামাবলম্বিত শরৎ ও বসন্তকাল-বিহিত উৎসবাদি সহিত যে সমস্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা, সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া, এবং শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত, স্নান, দান, তীর্থসেবা, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্ম, নিত্য-দেবসেবা, নিত্য-হোম, নিত্য অতিথি-সেবা প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে তাহাই ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম। তৎ সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মোতে সমন্বিত এবং সর্ব্ব প্রকার অধিকারির উপযুক্ত। এই সামাজিক ধর্ম্মে মতিস্থির রাখিয়া উচ্চাধিকারীরা স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন ও যোগ-সাধনাদি করিতে পারেন। ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ মননের প্রথা এই ভারতবর্ষে সনাতন হইতেই আছে। অতএব ব্রাহ্মেরা যদি স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী বেদান্ত ও তন্ত্রাদি শ্রবণ ও প্রণব গায়ত্রি প্রভৃতি জপের দ্বারা স্ব স্ব জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন; হরিভক্তেরা যদি ভাগবতাদি শ্রবণ ও হরিনামাদি জপের দ্বারা আপনাদের ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করেন, থিয়সফীষ্টগণ যদি যোগাচার শিক্ষার্থ যোগশাস্ত্রের শ্রবণ মনন ও তদনুযায়ী আচরণ করেন, তাহাতে হিন্দুসমাজ প্রতিবন্ধক নহেন। কেবল প্রাগুক্ত সামাজিক ধর্ম্ম ত্যাগই হিন্দুসমাজের রুচি-বিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এবং শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

# একাদশ অধ্যায়।

## শাস্ত্রসমন্বয়।

"বেদশব্দেভ্যএবাদৌ" ভগবান হিরণ্যগর্ভ বেদশাস্ত্র হইতেই অবগত হইয়া এই সৃষ্টিতে প্রাণিগণের নাম, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। কেননা (কুল্লুক ভট্ট কহেন যে) "প্রলয় কালেপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিঃ স্থিতঃ" প্রলয়কালেও পরমাত্মাতে বেদসকল সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করে। সৃষ্টিকালে সেই বেদবিহিত ব্যবস্থানুসারেই সামাজিক ধর্ম্ম বিরচিত হয়। (মনু ১।২১) "বেদোঽখিলধর্ম্মমূলং" অখিল বেদ শাস্ত্রই ধর্ম্মের মূল প্রমাণ। (ঐ ২।৬) "যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মোমনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ। স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞান ময়োহি যঃ।" ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে সমস্তধর্ম্ম মনুকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে অর্থাৎ যাহা কিছু মনুস্মৃতিতে আছে, তাহা মনুর স্বীয় স্বতন্ত্র মত নহে কিন্তু সে সমস্তই বেদে প্রতিপাদিত আছে। কেননা তিনি সমস্ত বেদ সম্যকরূপে অবগত থাকায় লোকের হিতের নিমিত্তে কেবল বেদোক্ত ধর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন। (ঐ ২।৭) "পিতৃদেব মনুষ্যানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনং। অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।" দেবতা, পিতৃ, মনুষ্যাদিগকে হব্য কব্য অন্ন প্রদানরূপ সমস্ত ক্রিয়ারই প্রমাণ সনাতন বেদ শাস্ত্র। মীমাংসাদ্বয়, ন্যায়দ্বয়, সাংখ্যদ্বয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণাদি ষড়বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ বেদার্থজ্ঞাপক। সেই সব শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বেদের প্রমেয় ভাগ বোধগম্য হয় না। (ঐ ১২।৯৪)

সমস্ত শাস্ত্রই বেদমূলক। বেদের মধ্যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, তত্ত্ব, পদার্থ প্রভৃতির নানা অবয়ব। এক এক প্রকারের শাস্ত্রসকল তাহার এক এক প্রকার অবয়বের বিস্তার ও অর্থজ্ঞাপন করিয়াছেন। ইওরোপীয় দর্শনকারদিগের ন্যায় ঋষিরা কেহই

নিজ নিজ স্বাধীন যুক্তি বিরচিত বিদ্যা প্রকাশ করেন নাই। যাঁহারা এই বর্ত্তমান কালে ইওরোপীয় বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া এক এক শাস্ত্রকে এক এক ঋষির মত বলিয়া মনে করিতেছেন তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছেন। শাস্ত্রীয় নিগূঢ়ার্থ-জ্ঞানের অভাবে প্রাচীন-ভারত-সমাজে যাঁহারা বেদসমস্তকে, স্মৃতিসমস্তকে, এবং ঋষিগণকে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন মতস্থ বলিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের পক্ষে এই উপদেশ ছিল যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাও তদনুবর্ত্তী হইয়া জ্ঞান ধর্ম্মের সাধন করিবেন। কেননা আচার্য্য, গুরু, পিতা, পিতামহ প্রভৃতি মহাজনেরা শাস্ত্রীয় নিগূঢ়ার্থ ও স্থাপিত ব্যবস্থা সকল অবলম্বন করিয়াই ধর্ম্মাদির সাধন করিতেন। কিন্তু এই বর্ত্তমান কালে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রীয় নিগূঢ়ার্থ ও স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, মহাজনদিগের পন্থারও মান্য নাই, অথচ এই সর্ব্বনাশক ভ্রমটী বেশ রহিয়াছে যে "নানা মুনির নানামত"। রোগটী প্রবল কিন্তু ঔষধি ভক্ষণে অরুচী। যদিও স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় মাহাজন দিগের স্থলে এক্ষণে ভট্টমোক্ষমূলর প্রভৃতি বিদেশীয় ও বিজাতীয় মহাজনেরা স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রের অর্থান্তর উপস্থিত করিয়া আমাদের নবীনগণের বুদ্ধিকে আরও জঞ্জালগ্রস্ত করিয়াছেন। এমত দুরবস্থার কালে নব্যসম্প্রদায়কে শাস্ত্রের সমন্বয় ও সিদ্ধান্তভাগে আকর্ষণ করা সহজ নহে। ফলতঃ তাঁহারা যেরূপই বিশ্বাস করুন শাস্ত্র আপনাকে আপনি যেরূপে বুঝান তাহা তাঁহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। নব্যেরা অনেকে এই বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রের নানা অবয়ব লইয়া বক্তৃতা ও প্রতিবাদ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন

শাস্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মোপাসনা ভ্রমযুক্ত ; কেহ বলিতেছেন প্রতিমা পূজা মহাপাপ ও বেদবিরুদ্ধ ; কেহ বলিতেছেন ভগবদ্গীতা খানি কেবল বৈষ্ণবদিগেরই সাম্প্রদায়িক মত; কেহ বলিতেছেন তন্ত্র শাস্ত্রগুলি অতি কুনীতি প্রদর্শক; কেহ বলিতেছেন স্মৃতি ও দর্শন সমুহ ঋষিগণের স্বীয় স্বীয় মত। কেহ কোন ঋষিকে আপনার মনের মত কোন মতের আবিষ্কারক বলিয়া তাঁহাকে বিলাতি আবিষ্কারক দিগের ন্যায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রশংসা করিতেছেন আবার কেহবা ক্রোধপূর্ব্বক মনুসংহিতা খানিকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ পূর্ব্বক কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই সমস্ত নব্যদিগের মধ্যে শাস্ত্রের ঘোরতর অজ্ঞতা বিরাজ করিতেছে। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ও জ্ঞান-সম্বন্ধীয় মতপ্রকাশ স্থলে যদি শাস্ত্রকে স্পর্শ না করেন তবে বিশেষ দোষ হয় না। কিন্তু শাস্ত্র জানেন না অথচ মধ্য হইতে এক আধটা শাস্ত্রের কথা ব্যক্ত করায় কেবল অজ্ঞতা প্রকাশ পায় মাত্র। যদিও পাণ্ডিত্য বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের বিচার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু পরমার্থে সকল শাস্ত্রেরই এক তাৎপর্য্য। নব্যসম্প্রদায় শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য বিভাগে হস্তক্ষেপ করেন না। কেননা তাহা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা আপনারা জ্ঞান, ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতি সম্বন্ধে সমাজ সংস্কারে ব্রতী। এইনিমিত্ত তৎসমস্ত বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিরচিত করেন। যেতাৎপর্য্যটী মনের মতন সেইটী গ্রহণ করেন, যাহা মনেরমত নহে তাহা অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব না জানায় তাঁহারা কেবল উপর্য্যুপরি ভ্রমেই পতিত হন মাত্র।

সকল শাস্ত্রই যে বেদমূলক এবং কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই যে বেদবিহিত তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে

দেখাইয়াছি। তৎসমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ঋষির মত হইলে কোন শাস্ত্রের এবং কোন প্রকার তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য থাকে না। বেদই সকলের মূল। শিক্ষাশাস্ত্র, কল্পশাস্ত্ররূপ স্মৃতিরাশি, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ, নিরুক্ত নামক শব্দকোষ, ছন্দশাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্র এই ছয়প্রকার শাস্ত্র বেদাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ তৎসমূহ একমাত্র বেদেরই অঙ্গ স্বরূপ। মনু প্রভৃতি বিংশতি স্মৃতি-সংহিতা কল্পশাস্ত্রেরই নিবন্ধ মাত্র সুতরাং বেদার্থ জ্ঞাপক। জৈমিনিমীমাংসা ও ব্যাসমীমাংসা এই দর্শনদ্বয় যথাক্রমে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডের বিচার ও সিদ্ধান্তস্বরূপ। ন্যায় ও বৈশেষিক বেদ-বিরুদ্ধ তর্ক ও সংশয়াদি ভঞ্জন পূর্ব্বক বেদের ঈশ্বরাদি কতিপয় পদার্থকে প্রতিপাদন পূর্ব্বক নাস্তিকদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন বেদবিহিত সাংখ্যজ্ঞান এবং পাতঞ্জলদর্শন বেদপ্রতিপাদ্য যোগাঙ্গ সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ বেদকে অতিক্রম করিয়া কেহ কোন শাস্ত্র লেখেন নাই। ভারতবর্ষে বেদেরই আদি প্রামাণিকতা। স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ বেদের অধীন মাত্র। স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতির প্রমাণই বলবৎ।

যদিও দর্শনশাস্ত্র সমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে, কিন্তু সে বিরোধ শাস্ত্রীয় পরমার্থকে স্পর্শ করে না। আমরা এস্থলে তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ন্যায়শাস্ত্রে ও সাংখ্যদর্শনে বিদ্যার্থীগণের ব্যুৎপত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত বিস্তর শুষ্ক তর্ক আছে। মহর্ষি ব্যাস ব্রহ্ম-মীমাংসার দর্শনকার। তিনি দেখিলেন যে পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল সেই সকল শুষ্ক তর্ক লইয়া কালযাপন করেন। অতএব তিনি তাঁহাদের ইষ্টকামনায়

বৈদিক পরমার্থ জ্ঞাপকসূত্রের অবতারণা করিলেন। তিনি দেখিলেন বেদে আছে "নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া" ব্রাহ্মী-মতি তর্কেতে প্রাপণীয় নহে। তিনি এই শ্রুতির অর্থ জ্ঞাপন নিমিত্ত উপযুক্ত অধিকারীগণের মঙ্গলার্থ নিম্নস্থ সূত্রদ্বয় উত্থাপন করিয়া সাংখ্য ও ন্যায়পক্ষের শুষ্ক তর্ককে খণ্ডন করিয়াছেন। যথা—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয় মিতিচেদেব-মপ্যবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ" (২।১।৩) তর্ক কেবল বুদ্ধি সাধ্য। সুতরাং তাহার প্রতিষ্ঠা নাই। কিন্তু বেদ অচল-প্রতিষ্ঠ। তর্ক সেই বেদের বাধা জন্মাইতে পারে না। যদি তর্কই কর তবে শাস্ত্রের সমন্বয় হইবে না। সমন্বয়াভাবে মোক্ষ অসম্ভব। শাস্ত্রকে সমন্বয় করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি কেবল তর্কের দ্বারা কাল হরণ করা যায় তবে কপিল ও গৌতমাদি ঋষিদিগের মীমাংসিত বেদ বিহিত মোক্ষেরও অভাব উপস্থিত হইবে। অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই। "এতেন শিষ্ঠা পরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ"। (২।১।১২) শিষ্টলোকে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া জানেন। তাহাই বেদবিহিত। অতএব নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের জানিয়া রাখা উচিত যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনোক্ত পরমাণুর জগৎ-কারণতা কেবল অবান্তর সিদ্ধান্ত। নতুবা কেবল পরমাণুকেই মূল জগৎকারণ বলিয়া তর্ককরা বৃথা পাণ্ডিত্য মাত্র। কেননা বেদ-বিরোধী তর্কের গৌরব নাই। শিষ্ট সকল তাদৃশ তর্ককে ত্যাজ্য-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (রাঃ মোঃ রাঃ বেদান্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

বেদে ব্রহ্মকে দুই প্রকারে উপদেশ করেন। এক তটস্থ-লক্ষণে, আর স্বরূপ-লক্ষণে। এই উভয় লক্ষণের তাৎ-পর্য্যই পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। তন্মধ্যে তটস্থ লক্ষণদ্বারা যে

ব্রহ্ম নিরূপণ তাহা অনুমান, তর্ক ও যুক্তি পরতন্ত্র। আর স্বরূপ-লক্ষণে যে ব্রহ্ম নিরূপণ তাহাই প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান। যাঁহারা যুক্তি, তর্ক, ও অনুমান-প্রিয় তাঁহাদের পক্ষে তটস্থ লক্ষণে ঈশ্বরাস্তিত্ব জ্ঞানই উপকারী। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন তাঁহাদেরই অধিকার দৃষ্টিতে ঐরূপ ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। উক্ত দর্শনদ্বয়ের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে নাস্তিক মত খণ্ডিত হইয়া ঈশ্বর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরলোকাদি প্রমাণীকৃত হইলেই যথাতথ রূপে বেদবিহিত জ্ঞানধর্ম্ম সুরক্ষিত হইবে। কিন্তু শাস্ত্রের উপক্রম উপসংহারাদির মর্ম্ম না জানিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, ও পরকাল থাকার পক্ষে যুক্তি ও অনুমান মাত্রই বুঝি প্রমাণ। তৎসমস্ত যে একমাত্র বেদমূলক তাহা অনেকে ধরেন না। বিশেষতঃ বেদমতে ব্রহ্মজ্ঞানটী যে উচ্চাধিকারীগণের পক্ষে আত্ম প্রত্যয়-সিদ্ধ এবং ধর্ম্ম ও পরলোক বিশ্বাস যে হৃদয়ের উত্তেজনা তাহা তাঁহারা ধারণ করিতে পারেন না। এইজন্য জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের অধিকার দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে ঐরূপ অনুমান-উপন্যাসকে না ব্যাসদেবই স্বীকার করিয়াছেন, না জৈমিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাস বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মানুভব-সিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্থাপন করিয়াছেন এবং "জন্মাদ্যস্য" সূত্রদ্বারা তাবতীয় তর্কানুমানকে সেই বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহায় মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা "শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্য অপি অভ্যুপেতত্বাৎ" (শাঃ ভাঃ) বেদেতেও তর্ক সকল সহায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। জৈমিনি কর্ম্মকাণ্ডের দর্শনকার। তিনি কর্ম্মীর অধিকার দৃষ্টিতে কর্ম্মসমবায়ী বেদমন্ত্রেতেই দেবতা রূপে ঈশ-

রাধিষ্ঠান রূপ বৈদিক তত্ত্বকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধর্ম্মের প্রবর্ত্তমান লক্ষণ বশতঃ যজ্‌মানের সঙ্কল্পিত ক্রিয়া সাধক বেদমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঈশ্বরাধিষ্ঠান বর্ত্তমান। সুতরাং তথায় তর্কানুমান স্থান পায় না। এজন্য তিনি কর্ম্মীদিগের অধিকারে দেবতারূপ ঈশ্বরকে প্রার্থনা-মন্ত্রের সহবাসী ও সহ-অবিশ্বাসসিদ্ধ জানিয়া তাঁহাদের পক্ষে তদতিরিক্ত অনুমান ও যুক্তিপরতন্ত্র ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস প্রয়োজনীয় বোধ করেন নাই। তিনি কর্ম্মীগণের পক্ষে কহিয়াছেন "অনুমানশতৈরপ্রে-নেশ্বর সিদ্ধতি"। শত শত অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। এখন জৈমিনির এইমাত্র উক্তি শুনিয়া যদি কেহ জৈমি-নিকে অনীশ্বরবাদী মনে করেন তবে কত বড় ভ্রম উপ-স্থিত হয়।

ফলে জৈমিনি কেবল কর্ম্মীদিগের অধিকার লক্ষ্য করি-য়াই ঐরূপ আনুমানিক ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে তিনি খণ্ডন করেন নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে দর্শাইয়াছি যে সমগ্র বেদের মধ্যে তাঁহার স্বীয় বিচারিত কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতি অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডীয় মুখ্যরূপ শ্রুতি সমূহকে তিনি অধিক আদর করিয়াছেন। তাঁহার স্বীয় পূর্ব্ব মীমাংসায় তিনি যে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে কোন উপ-দেশ দেন নাই তাহার কারণ আছে। এক কারণ এই যে তিনি ক্রিয়ার দর্শনকার, জ্ঞানের নহেন। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে কোন উল্লেখ করা তাঁহার অধিকারস্থ নহে। কেবল ফলকামী-দিগের উদ্দেশেই তিনি বেদ বিচার করিয়াছিলেন। আর এক কারণ এই যে ফলকামী জন ব্রহ্ম বা ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান লইয়া কি করিবেন? তিনি ফল চান। অতএব জৈমিনি

কেবল বিধিবিহিত কর্ম্মেতেই ঈশ্বরের ফলদাতৃস্বরূপ সেরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহা আপনার মতে করেন নাই কিন্তু বেদ মতে করিয়াছেন। তৃতীয় কারণ এই যে ফলকামীগণ ক্রমে ক্রমে লব্ধ ফলের অনিত্যতা জানিয়া চিত্তশুদ্ধি বশতঃ ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন ইহা বেদের উদ্দেশ্য। সাধারণ নরস্বভাব সেই পথকেই অভিনন্দন করে। নরের অদৃষ্ট সেই রূপ ক্রমোন্নতিজনক ধাতুদ্বারা বিরচিত। সুতরাং জৈমিনি সেই বেদ, স্বভাব, ও অদৃষ্টের বিরোধে কিছু বলেন নাই। সাধকেরা তাদৃশ ফলকামনারূপ ধর্ম্মাধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইলেই জৈমিনির উদ্দেশ্য সফল হয়। তখন তাঁহারা ব্যাসের প্রণীত বেদ বেদান্ত সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারে উপনীত হন। এতাবতা ন্যায়, বৈশেষিক, কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ঋষিগণের নিজ নিজ মত নহে; তৎসমূহ ঈশ্বরবাদ, পরমাণুবাদ, কর্ম্মবাদ, নিরীশ্বরবাদ, মায়াবাদ, ব্রহ্মবাদ প্রভৃতিরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতও নহে; কিন্তু সে সমস্তই মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায়, একটী বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা পত্রের ন্যায়, একটী নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায়, একমাত্র মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদরূপ মূলশাস্ত্রে সমন্বিত। কেবল অধিকারের ভিন্নতা হেতুক এইসকল অঙ্গভেদ, প্রস্থান-ভেদ ও শাখা-ভেদ মাত্র। কিন্তু মহাসাগর যেমন সকল নদনদীর বীজ ও সম্মিলন স্থান একমাত্র বেদশাস্ত্র সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রের উৎস ও লয়স্থান।

অতঃপর আমরা আর একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা করি কপিলোক্ত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই অনেকেই এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা লইয়া আমাদের

নব্য ভ্রাতারা এপর্য্যন্ত বিস্তর কোলাহল করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। কিন্তু সহৃদয় পাঠক ইহা কি কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন যে, যে সাংখ্যজ্ঞানের সমাদর সর্ব্বশাস্ত্রে তাহা ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক বেদবিরুদ্ধ! একটু ধীর হইয়া বিচার পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সাংখ্য ও বেদান্তে ঈশ্বর ও মোক্ষ বিষয়ে প্রায় ভেদ নাই এবং উভয় শাস্ত্রই প্রায় সমভাবেই বেদার্থের জ্ঞাপক। এক্ষণ বেদের এই দুইটী তত্ত্ব সাবধানে ধারণ কর। প্রথমতঃ বেদোক্ত ব্রহ্ম জীবের মোক্ষাধিকারে মুক্তিস্বরূপ। সে অধিকারে ব্রহ্ম নিস্ক্রিয় নিত্য ও নিরঞ্জন। দ্বিতীয়তঃ জীবের সংসারাধিকারে অর্থাৎ সৃষ্টিসম্বন্ধে সেই ব্রহ্ম অনিত্য ঈশ্বর মাত্র। তিনি সৃষ্টির সহিত হিরণ্য গর্ভাদি উপাধিতে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে আবির্ভূত। প্রলয়ে বা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে সেই ঔপাধিক আবির্ভাবটী লুপ্ত হইয়া যে নিস্ক্রিয়-ব্রহ্ম সেই নিস্ক্রিয় ব্রহ্মই থাকেন। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে একজন নিত্য ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। এস্থলে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা বা হিরণ্য গর্ভের নাম ঈশ্বর অতএব মহর্ষি কপিল বেদের এই ভাবটি প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে সূত্র বাঁধিলেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন। পশ্চাৎ বহু বিচারের পর (কঃ সূঃ ৩।৩৫) আর এক সূত্র উত্থাপন করিলেন "সহি সর্ব্ব বিৎ সর্ব্বকর্ত্তা"। যিনি প্রলয়ে লীন-জীবগণের সন্নিধিবর্ত্তিনী সমষ্টি প্রকৃতিতে উপ-হিত থাকেন তিনি সৃষ্টিকালে পুনরাবির্ভূত হন; তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব জগতের কর্ত্তা। তিনিই ঈশ্বর তিনিই আদিপু-রুষ, তিনিই প্রত্যেক নবসৃষ্টিতে প্রথমজ। এইপর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য্য পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন। যদি তাহাই হয়

তবে একজন ঈশ্বর অস্বীকার করা অসম্ভব? ইহাতে কপিল পর সূত্র উপস্থিত করিলেন। "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃসিদ্ধা" এ প্রকার ঈশ্বর থাকা নিশ্চয়। কারণ প্রলয়ে-লীন জীবসমষ্টিগত প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ একজন প্রয়োজন-বিজ্ঞবান্ সৃষ্টিকর্ত্তার উদয় ও অস্তিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। কেবল নিত্যঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্যের প্রতিবাদ। ফলতঃ স্মৃতি, বেদান্ত, গীতা ও পুরাণ প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের ঈশ্বর রূপ উপাধিটী জন্ম ও বিনাশশীল। "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব" ( মুণ্ড ১।১।১ ) বিশ্বের কর্ত্তা ব্রহ্মা, অর্থাৎ ঈশ্বর সকল দেবতার অগ্রে উৎপন্ন হন। "বিনাশং" (ঈশ ১৪) "বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ভং"। হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিনাশশীল। অতএব কপিল ঈশ্বর মানিয়াছেন ইহা স্থির হইল। এবং সেই ঈশ্বর বেদ বেদান্ত সম্মত অনিত্য ঈশ্বর তাহাও নিষ্পন্ন হইল।

এইক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তবে কপিল কেবল পুরুস ও প্রকৃতির যোগে সৃষ্টি হওয়ার কথাই কেন বলিয়াছেন? ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের যেরূপ উল্লেখ উপরি উক্ত সূত্রে আছে, সৃষ্টিক্রিয়া প্রতিপাদনের স্থলে সেরূপ উল্লেখ কেন করেন নাই? ইহার উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

মহর্ষি কপিল বেদের অবিরোধেই ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্বরূপ ঈশ্বরোপাধিকে পুরুষের সহিত একীভূতরূপে দৃষ্টি করিয়াছেন। বেদান্তেও সর্ব্বজীবের বুদ্ধি সমষ্টির অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই ঈশ্বর ও প্রকৃতির যোগে সৃষ্টি হয়, অথবা ইহাই বল যে সেই ঈশ্বর-সম্পন্ন পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে সৃষ্টি হয়। মহর্ষি কপিল প্রকৃতিতে

যুক্ত সমষ্টি পুরুষের সহিত সেই ঈশ্বরকে একাধিকরণে দৃষ্টি করায় আর স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই।

কপিলের পুরুষটীকে ভাঙ্গিয়া বুঝা উচিত। পুরুষ শব্দে জীবাত্মা। জীবাত্মা নানা সম্বন্ধে জড়িত। আমরা এক্ষেত্রে সেই সম্বন্ধকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করিব। যথা প্রকৃতি, ঈশ্বর, ব্রহ্ম। প্রকৃতি জীবের সহিত যুক্ত। প্রকৃতিই জীবের বাসনা-রূপিণী। প্রকৃতিই জীবের বাসনা-স্থানে থাকিয়া জীবের ভোগার্থ সৃষ্টিকে প্রার্থনা করে, আবার প্রকৃতিই উপকরণবতী হইয়া সৃষ্টি রচনা পূর্ব্বক সেই প্রার্থনা পূরণ করে। ঈশ্বর সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ ও নিয়ন্তা। তিনি স্বতন্ত্র স্থানে থাকিয়া কার্য্য করেন না। তিনি জীব-সমষ্টিতে উপহিত বা যুক্ত থাকিয়া জীব-সমষ্টির যোগে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অতএব সমষ্টি-জীব ও তদুপহিত ঈশ্বরতত্ত্বকে কপিল একত্রে পুরুষ সংজ্ঞা দেওয়ায় আর স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই।

জ্যোতিঃ ও চর্ম্মচক্ষুর নিগূঢ় সম্বন্ধ বিশিষ্ট নয়নের ন্যায় ঐ পুরুষটী ঈশ্বর ও জীবের বা ব্রহ্ম ও জীবের সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ উভয়ে সমানাধিকরণে স্থিত। ব্রহ্ম একভাগে মোক্ষ-রূপে ও আর এক ভাগে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বররূপে জীবেতে নিয়ত বাস করেন। সেজন্য কপিলদেব ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে জীব হইতে বিভক্তরূপে দেখান নাই। একই পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়া-ছেন। জ্যোতির অভাবে যেমন চক্ষুর রূপদর্শকত্ব জন্মে না, কূটস্থ ব্রহ্মের চিদাভাসাভাবে সেইরূপ জীবের জীবত্ব প্রস্ফু-টিত হয় না। জ্যোতিঃ সম্পন্ন চক্ষুকে যেমন চক্ষুই বলা যায়, জ্যোতিঃ বলা যায় না; কপিলদেব সেইরূপ কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য সম্পন্ন জীবকে পুরুষ অর্থাৎ জীব সংজ্ঞাই দিয়াছেন। মোক্ষ-

রূপ ব্রহ্ম ও সৃষ্টিকর্তৃস্বরূপ ঈশ্বরত্ব তাহারই মধ্যে ভুক্ত আছে। অর্থাৎ মোক্ষরূপ ব্রহ্ম জীবের প্রকৃতিভাগের অতীত-রূপে জীবের সহ এক হইয়া আছেন; এবং সৃষ্টিকর্ত্তারূপ ঈশ্বর জীবের প্রকৃতিভাগের সহিত এক হইয়া আছেন। এইজন্য কপিল আর স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা স্বতন্ত্র ব্রহ্ম স্বীকার করেন নাই।

সাংখ্য ঐ মিশ্রিত পুরুষের জীবরূপ উপাধিকে ব্যবহার স্থলে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে যেমন পুরুষ নামে কহিয়াছেন, বেদান্ত সেইরূপ ঐ মিশ্রিত পুরুষের ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-পক্ষকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকৃতির অধিকারে জীবকে ঈশ্বরের অধীন ও ঈশ্বরকে স্বতন্ত্ররূপে দেখিয়াছেন এবং মোক্ষাধিকারে ঐ জীবকেই ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে দৃষ্টি করত তাঁহাকে ব্রহ্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন। সাংখ্য জীবের ব্রহ্মপক্ষকে "কেবল্য" আখ্যা দিয়াছেন। বেদান্ত মোক্ষাবস্থায় ঐ একমাত্র ব্রহ্মপক্ষকেই গ্রহণ পূর্ব্বক জীবপক্ষকে ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সংবৃত, বেদান্তে সাংসারিকাবস্থায় জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব সংবৃত ব্রহ্মই সকল। নয়নের সাহায্যকারী জ্যোতির মহিমা কর্ত্তৃক যাঁহার মন আকর্ষিত হয় তিনি যেমন "চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি" এই পক্ষ ত্যাগ পূর্ব্বক "আলোক দ্বারা দেখিতেছি" বলেন; সেইরূপ, জীবের জীবন-স্বরূপ, শুষ্কহৃদয়ের রসস্বরূপ, ব্রহ্মের মহিমাকর্ত্তৃক যে সকল বেদান্তবিজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষির চিত্ত আকর্ষিত হইয়াছিল, তাঁহারা ব্রহ্মকেই মুখ্য আত্মারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক নামমাত্র জীবকে ত্যাগ করিয়াছেন। এতাবতা ঋষি ও আচার্য্যদিগের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক

দৃষ্টিভেদে সাংখ্যোক্ত ঐ একই পুরুষ কোথাও জীবরূপে, কোথাও ঈশ্বররূপে, কোথাও বা ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হন। কপিলদেব শ্রুতির অবিরোধে ঐ মিশ্রিত পুরুষকে গ্রহণ করায় আর স্বতন্ত্র "ঈশ্বর" বা "ব্রহ্ম" সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার মতে জীব-সমষ্টির সন্নিধিবর্ত্তিনী প্রকৃতি ঐ সমষ্টি পুরুষের আশ্রয়ে জগৎরূপে পরিণত হন। তাহাতে ঐ পুরুষেতে যতটুকু ঈশ্বরত্ব ও হিরণ্যগর্ভত্ব আছে, তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র ঈশ্বর যাহা লোকে চায় বা অনুমান করে তাহা অসিদ্ধ। কেননা সর্ব্বভূতের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতারূপেই ঈশ্বরের নির্দ্দেশ এবং একথা বেদান্ত-সিদ্ধ। ভূত, ইন্দ্রিয়, স্থূলশরীর, সূক্ষ্মদেহ, ভোগ প্রভৃতির আবির্ভাব নিমিত্ত যতটুকু আশ্রয়, গুণ, শক্তি, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, মহত্ব, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, প্রভৃতি প্রয়োজন তত্তাবতই ঐ পুরুষ ও তৎসহকারিণী শক্তি-স্বরূপিণী প্রকৃতির সম্বন্ধ মধ্যে আছে। সুতরাং সাংখ্য বলেন—প্রজা হইতে স্বতন্ত্র রাজার ন্যায় প্রকৃতি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনার প্রয়োজন কি?

সৃষ্টিক্রিয়া উদ্ধারের নিমিত্তে মহর্ষি কপিল এইরূপে প্রকৃতির সন্নিধানে স্থিত চেতন জীবে ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব সংগোপনে রাখিয়া জীবের মুক্তির নিমিত্তে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবাত্মার সহিত আর তদীয় অন্তরাত্মা স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তাহাই জীবের মোক্ষজনক। সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের উপকরণ স্বরূপ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতির নিয়ামক ঈশ্বর হইতে জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি করিলে জীবাত্মাতেই যে একটি ব্রহ্মস্বভাবসম্পন্ন পরমাত্মীয় অবস্থা বা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ বাক্য-মনের অগোচর আনন্দ-স্বরূপ কৈবল্যভাব দৃষ্ট হয়

তাহাই মোক্ষ। তাহা প্রকৃতিগত ও উপাধিগত সর্ব্ব প্রকার রূপ নাম বিশেষণাদি বিবর্জিত। তাহা অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনীয় ও সনাতন। তাহার কোন নাম নাই বলিয়া কপিলদেব তাহাকে কৈবল্যমাত্র বলিয়াছেন। বেদ বেদান্তের প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-শব্দটী স্বরূপতঃ ঐ ভাবকেই প্রতিপাদন করে। কিন্তু তদতিরিক্ত, বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবের সোপাধিক অধিকারের উপযুক্তরূপে ব্রহ্মকে সগুণভাবেও উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে বৈদান্তিক মুখ্যজ্ঞান-বিহীন সাধারণ লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে ব্রহ্ম কেবল সগুণ ও উপাস্য মাত্র। কি জানি "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহারে যদি লোকের ঐ মিথ্যা সগুণ-সংস্কার কর্ত্তৃক ব্রহ্মের নির্গুণ, নিরুপাধিক অনন্য, অভিন্ন ও কৈবল্য স্বরূপ ভাব বাধিত হয়, এই ভয়ে মহর্ষিকপিল "ব্রহ্ম" নাম ব্যবহার না করিয়া "কৈবল্য" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার প্রকৃতিজনিত ভোগরূপ বন্ধন যুক্ত যে জীব-ভাগ তাহা পুরুষ প্রকৃতির ভেদ-বিচার ও বাসনা-ক্ষয় ব্যতীত মুক্তিলাভ করে না। তাদৃশ উপায়ে মুক্তিলাভ করিলেই উপরি-উক্ত প্রকৃতির অতীত এবং ঈশ্বরোপাধি হইতে মুক্ত "ব্রহ্ম" লাভ হয়। সেই মুক্তিলাভ বা ব্রহ্মলাভ একই কথা। তখন ব্রহ্ম-ভাগের ঈশ্বরত্ব ও জীবভাগের ব্যবহারিক জীবত্ব নষ্ট হইয়া ব্রহ্মভাগের কেবল নির্ম্মল ব্রহ্মত্ব এবং জীবের পক্ষে প্রকৃতি স্পর্শ বিহীন ঐ ব্রহ্মরূপ কৈবল্য-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এতাবতা মহর্ষি কপিলের মতে "বাসনা-রূপিণী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর" ও "জৈবিক-মোক্ষের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম বা অভিন্ন স্বরূপ কৈবল্যের" অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অসিদ্ধ। এই মত বেদবেদান্তের বিরোধী নহে।

মহর্ষি পাতঞ্জলী জীবের অন্তর্যামী উক্ত ব্রহ্মকেই সগুণরূপে "ঈশ্বর" এবং মুক্তি-সম্বন্ধে "প্রত্যক্ষ-কৈবল্য" রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ কপিলের দর্শনে যে পরমাত্মা গুহ্যরূপে অধিষ্ঠিত, পাতঞ্জলে তিনিই ব্যক্তরূপে উক্ত হইয়াছেন।

নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নির্গুণ, তুরীয় পদবাচ্য বেদান্ত-সিদ্ধ যে ব্রহ্মতত্ত্ব সৃষ্টি-সংসারের অতীত সেই সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত তত্ত্বকে মহর্ষি কপিল সৃষ্টিতত্ত্ব-শ্রেণীর অর্থাৎ সংসারের অতীত রাখিয়া কৈবল্য নাম দিয়াছেন। তাহাই জীবের হৃদয় মণ্ডলস্থ সংসারাতীত-স্বরূপ ভাব। সেই ভাব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং বেদান্তমতে মুক্তি যেমন পুরাতন বস্তুর ন্যায় লাভ হয়, সাংখ্যমতেও কৈবল্য তদ্রূপ। কেননা তাহা প্রকৃতি সম্বন্ধ-ব্যবচ্ছেদক পরমাত্মজ্ঞান মাত্র। আমরা যদি মহর্ষি কপিলের ভাব ও ভাষা ভাঙ্গিয়া আমাদের ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করি, তবে এই বলিতে হয় যে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তারূপেও জীবের সহ এক—তারক-ব্রহ্মরূপেও জীবের সহ এক। এই অভেদ-ভাব ছাড়িয়া ভিন্নরূপে ব্রহ্ম অনুভব বা ঈশ্বর স্বীকার অযুক্ত। মহর্ষি কপিল প্রচলিত "ঈশ্বর" বা "ব্রহ্ম" নাম দ্বারা ভারতকে উন্মত্ত করেন নাই, কিন্তু ভাবে উন্মত্ত করিয়াছেন। প্রাচীন ঋষিগণ সে ভাবের গ্রাহক ছিলেন এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহা বৈদান্তিক জ্ঞানের সহিত অভেদে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এই কারণে কোন হিন্দু যে তাঁহাকে নাস্তিক বলিবেন এমন ক্ষমতা কাহারো হয় নাই—হইবেও না। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের দ্বেষ্টা ছিলেন না—তিনি বেদ, শৌচাচার, জন্মজন্মান্তর-ব্যাপী জীবের নিত্যতা, সন্ধ্যাবন্দনা, যোগসাধন প্রভৃতি আর্য্যধর্ম্মের প্রধান প্রধান সকল,

অঙ্গের প্রতিই সমাদর প্রদান করিয়াছেন, এবং হিন্দুরাও কেহ তাঁহার প্রতি কখনও দ্বেষ করেন নাই। বরং সাংখ্যদর্শনোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব সমগ্র আর্য্যসমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বিভূতি-যোগাধ্যায়ে "সিদ্ধানাং-কপিলোমুনি" "পরমার্থতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে কপিল মুনি আমি" বলিয়া তাঁহার প্রতি পরম সমাদর প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু সন্ন্যাস-যোগাধ্যায়ে মীমাংসা বাক্যের ন্যায় বলিয়াছেন "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি নপণ্ডিতাঃ। একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতেফলং"॥ "সাংখ্য-জ্ঞাননিষ্ঠা" অর্থাৎ প্রাকৃতিক তত্ত্বভেদ ও প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান দ্বারা যে কৈবল্য অনুভব হয়; এবং 'যোগ' অর্থাৎ নিষ্কাম-ক্রিয়া ও আর্য্যভূমির সামাজিক ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যাগাদি;—এই সাংখ্য এবং যোগ, যে ভিন্ন ভিন্ন মত বা পৃথক্ পৃথক্ ফলদায়ক একথা 'বালা' অর্থাৎ বালকমতি অজ্ঞ লোকেরা বলেন, পণ্ডিতেরা বলেন না। কেননা তদুভয়ের একপক্ষাশ্রয়ী ব্যক্তি উভয় পক্ষেরই ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাংখ্যশাস্ত্র নাস্তিক শাস্ত্র নহে এবং তাহার সহিত ভারত-ভূমির ফলকামনা-বিরহিত ধর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। যাঁহারা ইওরোপীয় বিদ্যা আস্বাদন পূর্ব্বক এই বর্ত্তমান কালে সাংসারিক সুবিধার নিমিত্তে বা অসভ্যতার ভয়ে ভগবানের সত্তা অস্বীকার করেন, তাঁহারা সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর শাস্ত্র জানিয়া যে তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছেন সে তাঁহাদের বিষম ভ্রম।

ষড়বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন যে একমাত্র বেদেতেই সমন্বিত সুতরাং নানা প্রকারে একই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মোদ্দিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডের

সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-জ্ঞাপক আমরা তাহা এপর্য্যন্ত বুঝাইলাম। এক্ষণে ইহাও বলিতে ইচ্ছা করি যে পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্-ভাগবত, রামায়ণ ও তন্ত্র শাস্ত্র সকলও একমাত্র বেদেরই তাৎপর্য্যজ্ঞাপক এবং বেদেতেই সমন্বিত। মহর্ষি ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও পরমারাধ্য সদাশিব দেখিলেন যে বেদ-শাস্ত্রের জ্ঞানলাভে বা তদনুযায়ীরূপে সকল ক্রিয়ার আচরণে স্ত্রী, শূদ্র, ও পতিত-দ্বিজগণের অধিকার ও ক্ষমতা নাই। এ নিমিত্তে তাঁহারা কৃপা করিয়া ঐ সকল শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। বেদে ও সমস্ত দর্শনে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই লোকের প্রভিন্ন অধিকারানুসারে ঐ সকল পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে।

মহাত্মা রামমোহন রায় (গোস্বামীর সহিত বিচারে) কহিয়াছেন যে "বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলো-"চনাতে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের "দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন*। শ্রুতিঃ। তমেতং বেদানুবচনেন "ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদ-বাক্যের "দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন"। কিন্তু "পুরাণ "ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের কর্ত্তা "তাঁহাতেই কহিয়াছেন। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ীন শ্রুতি-"গোচরা। ভারতব্যপদেশেনহ্যাম্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতা। স্ত্রী, "শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে

---

* মহাত্মা রামমোহন রায় "ব্রহ্মোপাসনা" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতিকে বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দ্বিবিধ অধিকারে বিভাগ করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ চিন্তাশীল পাঠক তাহা দৃষ্ট করিলেই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন।

"পারেন না এ নিমিত্তে ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের অর্থ "স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন।" "সর্ব্ববেদার্থসংযুক্তং পুরাণং ভারতং "শুভং। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং। সকল "বেদার্থ সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে "স্ত্রী শূদ্র পতিত-ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যাস কহিয়া-"ছেন।" (গোস্বামীজির সহিত বিচারগ্রন্থে) গোস্বামীজি রাম-মোহন রায়কে লেখেন যে "বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি যাহা জানিয়াছেন ও যাহা কহিয়াছেন তাহাই প্রমাণ"। একথার উত্তরে রামমোহন রায় কহিয়াছেন "এ যথার্থ বটে। "এই নিমিত্তই ভগবান বেদব্যাস বেদের সমন্বয়ার্থ যে শারী-"রক সূত্র করিয়াছেন তাহা বিশ্বের নিঃসন্দেহ মান্য হইয়াছে। "এবং স্ত্রী শূদ্রাদির নিমিত্ত যে পুরাণ ইতিহাস কহিয়াছেন "তাহাও মান্য এবং অধিকারী বিশেষে উপকারক হয়। একথা "আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি এবং বৈদব্যাস "ভিন্ন মনু প্রভৃতি ঋষিরা যাহা কহিয়াছেন তাহাও সর্ব্ব "প্রকারে মান্য"। অপরঞ্চ রামমোহন রায় লিখিয়াছেন (গোস্বা-মীর সহিত বিচারে) যে "বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থজ্ঞান "ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার "নাই, এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ "না জন্মে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু "ধর্ম্মসংহিতাতে তাবত বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ। "যৎকিঞ্চিন্মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজং। যাহা কিছু মনু কহিয়া-"ছেন তাহাই পথ্য। এবং বিষ্ণুরুদ্রাংশ সম্ভব ভগবান বেদ-"ব্যাস বেদান্তসূত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন এবং "ভগবান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রের এবং দশোপ-

"নিষদের ভাষ্যে তাবত অর্থ স্থির করিয়াছেন। অতএব বেদ
"দুজ্ঞের্য় হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন,
"ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না"। কিন্তু "পুরাণা-
"দিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাস ছলে
"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন,
"সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র অবশ্যই মান্য; কিন্তু পুরাণ ইতিহাস
"সাক্ষাত বেদ নহেন"। বেদই মূল। "তবে যে বেদের তুল্য
"করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহা-
"ভারতকে গুরুতর লিখেন আর আগমে আগমকে শ্রুতি, স্মৃতি,
"পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কহেন, সে পুরাণাদির প্রশংসা
"মাত্র। যেমন 'ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং' অর্থাৎ যেমন প্রত্যেক
"ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন যে, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত
"হইতে উত্তম হয়েন।" (গোস্বামীজীর পত্রোত্তরে)। "পুরাণ
"এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদি-
"তেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া
"পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন।" (ঈশোপনিষদের ভূমিকা)। তন্ত্র-
শাস্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মা রামমোহন রায় কহিয়াছেন (চারি প্রশ্নের
উত্তরে) "শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল
"শাস্ত্রের এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন; এবং
"তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ
"তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়"। তিনি গোস্বামীজির সহিত
বিচার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "যদি (বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সম্য-
"গুক্ত ময়ানঘে) এই বচনকে প্রমাণ করিয়া এমত বল যে মহেশ্বর
"কৃত তাবত শাস্ত্র অপ্রমাণ হয় তবে তান্ত্রিক দীক্ষা যাহা শাক্ত,
"শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এদেশে আশ্রয় করিয়া উপা-

"সনা করিতেছেন তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ঐ উপা-
"সনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয়; অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন
"যে কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবেক।
"আগমোক্তবিধানেন কলৌদেবান্ যজেৎসুধীঃ। যেহেতু
"ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-রহিত ব্যক্তিদিগের ঐরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার
"দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা
হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষেও রামমোহন
রায় তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি
( পথ্য প্রদানে ৫মঃ পরিচ্ছেদে ) লিখিয়াছেন যে ( তন্ত্রোক্ত )
"কুলাচার সর্ব্বথা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হয়েন।" এই কথার প্রমা-
ণার্থে তিনি কুলার্চ্চনদীপিকাধৃত তন্ত্র-বচন লিখিয়াছেন যথা
"অনেক জন্মনামন্তে কৌলজ্ঞানং প্রপদ্যতে। "ব্রতক্রতুতপ-
"স্তীর্থদানদেবার্চ্চনাদিষু। তৎফলং কোটিগুণিতং কৌলজ্ঞানং
"নচান্যথা। কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে।
"জীবপ্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেবচ। ক্ষিত্যপতেজোবায়বশ্চ
"কুলমিত্যভিধীয়তে। ব্রহ্মবুদ্ধ্যানির্ব্বিকল্পং এতেষাচরণঞ্চযৎ।
"কুলাচারঃ সত্রবাদ্যো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥" (এই সকল
বচন সহজ বিধায় এস্থলে আমরা তাহার অর্থ লিখিলাম না।)
মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক এবং নব্যদিগের
বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া আমরা তাঁহার এই সকল উক্তি
উদ্ধৃত করিলাম। এই সমস্ত ব্যাখ্যা হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন
হইতেছে যে, যাঁহাদের বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে অধিকার নাই,
সাধারণতঃ তাঁহাদের সকলের নিমিত্তে কি ক্রিয়া, কি ব্রহ্মজ্ঞান,
এই উভয় অধিকারেই পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে।
তন্মধ্যে পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ দ্বারা ইতিহাস, আখ্যান ও উদাহর-

ণের ব্যপদেশে অধিকাংশতঃ ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা জ্ঞাত হওয়া যাইবে ; আর তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রদীক্ষা ও ব্রহ্মেতে সমন্বিত নানা দেবতা পূজনরূপ কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ হইবে। তদ্ভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে সগুণ-ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি ও নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নাই।

এইরূপে অধিকারানুসারে পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র সকল এক-মাত্র বেদেতেই সমন্বিত। তন্ত্রোক্ত দেবদেবী সমস্তই বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবী মাত্র। তাঁহাদের নামে ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সে ভেদ সমন্বয় করা কঠিন নহে ; আমরা এস্থলে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। করিলে গ্রন্থ-বাহুল্য হইবে। তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ, বৈদান্তিক পঞ্চকোষভেদ, সাংখ্য ও যোগোক্ত তত্ত্ব ও প্রকৃতিভেদ, এ সমস্তই সমফলজনক। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকল বেদমন্ত্রেরই শব্দান্তর ও তুল্যার্থবাচী। তন্ত্রোক্ত আভিচারিক মন্ত্র সকল অথর্ব্ব বেদের মন্ত্র মূলক। কেবল বেদে অনধিকারী এবং বেদপাঠে অক্ষম ব্যক্তিদিগের মঙ্গল কামনায় তৎসমূহ সহজ ভাষায় রূপান্তরে প্রচার করিয়া-ছেন মাত্র। মানব-ধর্ম্মসংহিতার সুবিখ্যাত টীকাকার কুল্লুক-ভট্ট হারীত-বচন প্রমাণে লিখিয়াছেন "শ্রুতিপ্রমাণকোধর্ম্মঃ, শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ"। ( মনু ২।১) ধর্ম্ম শ্রুতি-মূলক। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডরূপ প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ নিবৃত্তি-ধর্ম্ম উভয়ই শ্রুতি-প্রমাণ-সিদ্ধ। সেই শ্রুতি দ্বিবিধ। বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী। তন্মধ্যে তান্ত্রিকী শ্রুতি সমূহই তন্ত্র-শাস্ত্রের মূল। এতাবতা তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদমূলক তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় করা উচিত নহে। সকল শাস্ত্রই মান্য। অধিকার ভেদে সকল শাস্ত্রেরই মঙ্গলোদ্দেশ্য।—

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় ধর্ম্মের আকরস্থানই বেদ। তর্ক ও পরমাণু-বিদ্যা; প্রকৃতিতত্ত্ব, যোগসাধন ও সাংখ্যজ্ঞান; সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও মায়াবিজ্ঞান; ফলকামনা বিশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ড ও নিষ্কাম ব্রহ্মোদ্দিষ্ট ক্রিয়া সাধন; ইতিহাস ও আখ্যানযুক্ত হিতগর্ভ কর্ম্ম, ব্রহ্ম ও যোগাদি বিষয়ক উপদেশ এবং তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান, ধর্ম্ম, পূজা, হোম প্রভৃতি—এ সমস্তই বেদের অন্তর্গত। বেদই সর্ব্ব প্রকার অধিকারির ধর্ম্ম, ব্রহ্ম, মুক্তি, যোগ প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার। যুগক্ষয়ে—প্রাচীন জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমুজ্জ্বলিত মানব সমাজের পতন হইলে—কালক্রমে অজ্ঞানতা নিবন্ধন বেদের সজীবভাব বিনষ্ট হইলে—মহর্ষিগণ প্রভিন্ন অধিকার দৃষ্টিতে স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে সেই বেদেরই সারার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরমারাধ্য ভগবান শিবোক্ত তন্ত্র মতে কলিযুগে মন্ত্র দীক্ষাদি হইবে ইহাই ব্যবস্থা। লোকাচার সম্বন্ধে মহা-নির্ব্বাণে কহিয়াছেন "বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কালৌ। আত্মতৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ"। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্ব যুগে বেদোক্ত বিধানেন আর কলিযুগে বেদোক্ত বা আগমোক্ত বিধানে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করি-বেন। এই তন্ত্রবচনটীকে মহাত্মা রামমোহন রায় বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ আগমোক্ত বিধান বেদবিরুদ্ধ নহে। শিববাক্য বেদবিরোধী হইতে পারে না। তন্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড বেদোক্ত ক্রিয়ারই রূপান্তর। তন্ত্রোক্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডেরই ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার ভাষা অতি সরল, অলঙ্কারযুক্ত ও ভক্তি-উত্তেজক। অতএব জ্ঞান, ভক্তি, ক্রিয়া, আচার এ সমস্তই বেদের অবিরোধে তন্ত্রেতে দেদীপ্য-

মান। এবং কলিযুগের পক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ। কাল সহকারে বেদের যে সকল ক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে, এবং বেদেতে যে সকল অনধিকার আছে, তন্ত্রশাস্ত্র সকল তাহাও পূরণ করিয়াছেন। সমস্ত মিথিলা ও বঙ্গবাসীগণ এবং ভারতের অন্যান্য অনেকস্থানের অনেক নিবাসী তন্ত্র মতেই দীক্ষিত। অতএব মহাদেব কৃপা করিয়া পরমাপ্রকৃতি স্বরূপিণী পার্ব্বতীকে উপলক্ষ পূর্ব্বক যদি তন্ত্রশাস্ত্র না বলিতেন, তবে ভারতের বড়ই দুরবস্থা হইত। তন্ত্রশাস্ত্র যেমন বেদের বিরোধী নহেন, সেইরূপ পুরাণাদিরও বিরোধী নহেন। কারণ তন্ত্রেতে যে যে দেবতার সম্মান পুরাণাদিতে তাঁহাদেরই নাম গান। পুরাণ-মতে মন্ত্র দীক্ষার নিয়ম নাই। গায়ত্রী, সন্ধ্যাবন্দনা, দশসংস্কার প্রভৃতি যেমন বেদমতে সম্পাদিত হয়; সেইরূপ অধিকারী ভেদে গায়ত্রী, সন্ধ্যা, ইষ্টদেবতার পূজা, এবং বিস্তর ক্রিয়া তন্ত্রমতে আচরিত হইয়া থাকে। পুরাণ শাস্ত্র এই সমস্তের প্রশংসায় এবং বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। পুরাণে সেই সমস্তই নানা উদাহরণ ও ইতিহাস দ্বারা বুঝাইয়াছেন। স্মৃতিতে সমস্ত বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা প্রদান ও পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন, এবং দর্শনে অধিকার ভেদে সেই কর্ম্মসকলের এবং ব্রহ্ম, ঈশ্বর, প্রকৃতি ও যোগবাক্য সকলের মীমাংসা করিয়াছেন। অতএব সকল শাস্ত্রই একমাত্র বেদেতে সমন্বিত। যিনি উদারচিত্তে বলিতে পারিবেন যে "আমি সর্ব্ব শাস্ত্রকে মানি; পারগ হই বা না হই, সর্ব্ব শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী আচরণ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই"; তিনি আমাদের বিবেচনায় সমদর্শী ও যথার্থ সাধু। তিনি ভারদ্ধর্ম্মকল্প-বৃক্ষের কেবলমাত্র কাণ্ড, কেবলমাত্র শাখা বিশেষ, বা

কেবলমাত্র পুষ্প ফল বিশেষের পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত সশাখা-প্রশাখা, সপল্লব, সপুষ্প, সমস্ত বৃক্ষের পক্ষপাতী। একজন বিজ্ঞ প্রাচীন কবির উক্তি আছে—

> "বেদেকাঞ্চনপত্তনে পরিলসৎ বেদান্ত দুর্গম্ মহৎ। মীমাংসা পরিখা বিরাজতি পুরঃ শাব্দং লসৎ গোপুরং।। যোগোযামিক জাগরুক নিবাঃ সাংখ্যং বিবেকৈকদৃক্। ধর্ম্মোদ্যানমুষো ভবন্তি সুগতাৎ নৈয়ায়িকাঃ কুক্কুরাঃ॥" অর্থ—বেদরূপ কাঞ্চনময় পুরির মধ্যে বেদান্তরূপ মহাদুর্গ দীপ্তি পাইতেছে। তাহার পুরোভাগে মীমাংসা-রূপ পরিখা সমস্ত-পুরিকে বেষ্টন করিয়া আছে। ব্যাকরণ শাস্ত্র ঐ পুরির গোপুর স্বরূপে শোভা পাইতেছে। যোগ বিদ্যা সমূহ নিশাকালের বিভিন্ন যামে উক্ত পুরির প্রহরী স্বরূপ। সাংখ্য জ্ঞান সমস্ত পুরির বিবেকী ধর্ম্মাধিকারীরূপ সদ্বিচারক। ঐ পুরির মধ্যে ফুল ফল বিশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডরূপ ধর্ম্মই উদ্যান স্বরূপ। কর্ম্মকাণ্ড ও ঈশ্বরদ্বেষী নাস্তিকগণ সেই ধর্ম্মোদ্যানের ফুল ফল অপহারক ও নষ্টকারী চৌর স্বরূপ। ন্যায় বিদ্যা সমূহ সেই সকল নাস্তিক ধর্ম্মদ্বেষী চৌরগণকে পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত বলবান কুক্কুর স্বরূপ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ও সমস্ত শাস্ত্রকেই সমদৃষ্টিতে মানিয়া গিয়াছেন। তিনি অকুণ্ঠিত মনে কহিয়াছেন (পথ্যঃ প্রঃ ৭ঃ পঃ) যে, "কি শিববাক্য, কি দেবী-"বাক্য, কি ব্যাসাদি ঋষিবাক্য সকলই শাস্ত্রবোধে মান্য "হয়েন"। তিনি কুলার্ণবের এই বচন প্রমাণ (পথ্যে ৭) ষড়্‌দর্শনকে ভগবানের অঙ্গস্বরূপ কহিয়াছেন। "ষড়দর্শনানিমাঙ্গানি পাদৌকুক্ষিকরৌশিরঃ। তেষু ভেদঃ হি যঃ কুর্য্যান্মমাঙ্গচ্ছেদএবহি"। পাদদ্বয়, হস্তদ্বয়, উদর ও মস্তক এই আমার (ব্রহ্মের) ছয় অঙ্গ ষড়্‌দর্শন হয়েন। ইহাতে যে ভেদ জ্ঞান করে, সে আমার (ব্রহ্মের) অঙ্গ ছেদ করে। এস্থলে এমন তাৎপর্য্য গ্রহণে হানি নাই যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন পাদদ্বয় স্বরূপ। কারণ তদ্দ্বারা লোকে প্রথমতঃ বুদ্ধি পূর্ব্বক

শাস্ত্ররাজ্যে চলিতে শিখে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল বাহুদ্বয়স্বরূপ। তদ্দারা অভ্যাস যোগ ও প্রকৃতিপুরুষ ভেদজ্ঞানরূপ বাহুবল লাভ হয়। ধর্ম্মমীমাংসা উদর। কেননা তদ্দারা জন্মজন্মান্তরব্যাপী ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান ও ভোগোপভোগ হইয়া ব্যবহারিক জীবত্ব রক্ষা পায়। আর বেদান্ত মস্তক। তদ্দারা আত্মানুভব-যুক্ত-ভক্তি ও পরমাত্ম-জ্ঞানের সাধন হয়। মহাত্মা কুল্লুকভট্ট মানব সংহিতার অনুক্রমণিকাতে সর্ব্ব শাস্ত্রকে আদর পূর্ব্বক কহিয়াছেন—"মীমাংসে বহুসেবিতাসি সুহৃদস্তর্কাঃ সমস্তাঃস্থমে, বেদান্তাঃ পরমাত্মবোধগুরুবো যূয়ং ময়োপাসিতাঃ।" অর্থাৎ হে ধর্ম্মমীমাংসে তুমি সেবনীয়। কেননা রাজ বিধির ন্যায় তোমার বিধি সকল বিনা তর্কে পালনীয়। ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি তর্ক সমস্ত সুহৃদতুল্য। বেদান্ত পরমাত্মবোধের গুরু, সুতরাং উপাসনীয়—কেবল পালনীয় বা সুহৃদমাত্র নহেন। এতাবতা সকল শাস্ত্রই বেদার্থজ্ঞাপক। এবং কোন শাস্ত্রই বৈদিককর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধী নহেন।

---

# উপসংহার।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম তাহার সার মর্ম্ম এই যে বেদবিহিত হিন্দুধর্ম্মই ভারতের সর্ব্ব প্রকার অধিকারির উপযুক্ত এবং ভারতবর্ষের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কল্যাণের একমাত্র হেতু। বিধিনিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ, সগুণব্রহ্মনিষ্ঠ, যোগনিষ্ঠ, এবং নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানী এই সমস্ত অধিকারির প্রত্যেকের পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের বিভাগ বিশেষ যেমন বিশেষ বিশেষ ফলজনক; সেইরূপ ইহার সামাজিক অংশ স্বরূপ বিধিকাণ্ড ধর্ম্মদৃষ্টিতে বা ঈশ্বরদৃষ্টিতে, সকাম বা নিষ্কামভাবে, চিত্ত শুদ্ধি-জন্য বা লোক-শিক্ষার্থে সর্ব্ব প্রকার অধিকারির সাধারণ ধর্ম্ম। এই বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম-সেবির হৃদয়ে মুদ্রিত আছে।

আমরা হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রভৃতির যে সকল অবয়ব দর্শাইয়াছি, তাহার যে সমষ্টিভাব তাহাই হিন্দুধর্ম্ম শব্দের বাচ্য। নতুবা তাহার কোন এক অংশ—তাহা বিধিই হউক, যোগই হউক, ব্রহ্মোপাসনাই হউক, আর ব্রহ্মজ্ঞানই হউক, তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম নহে। বিধিবিহিত ধর্ম্মক্রিয়া পালনে সমাজ রক্ষা হয় বটে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরতত্ত্ব বিহীন হইলে মোক্ষফল-জনক হয় না। পক্ষান্তরে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা ভারতের পরম্পরাগত সামাজিক ধর্ম্মের উচ্ছেদক হইলে অকল্যাণপ্রসূত হইয়া কর্ত্তাতে পাপস্পর্শ হয়। অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বরার্থ ও লোকশিক্ষার্থ নির্লিপ্ত হইয়া সামাজিক বেদবিধি পালন করেন

বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মোপাসকেরা যদি তাহা না করেন এবং যদি বেদবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত নবতর বিধি অনুযায়ী নিত্য, নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া কর্ম্ম করেন, তবে আর তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গরূপে গণনা করা উচিত হইবে না। তাহাকে উপধর্ম্ম মাত্র কহা যাইবে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম উপধর্ম্ম ছিল না। তাহা হিন্দুধর্ম্মের উত্তমাঙ্গরূপে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তদবলম্বীগণ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল শিষ্ট পরম্পরা—সিদ্ধরূপে হিন্দুধর্ম্ম মতেই আচরণ করিতেন। এই ভারতবর্ষের যে কোন ধর্ম্মে নিত্যনৈমিত্তিক, দৈব ও পিতৃক্রিয়া বেদবিহিতরূপে আচরিত না হয়, সে সমস্ত ধর্ম্মই উপধর্ম্ম শব্দের বাচ্য। নানকপন্থী, রামানুজী, কবীরপন্থী, আকড়া-আশ্রমী চৈতন্যসম্প্রদায়—এ সমস্ত উপাসকগণের ধর্ম্মই উপধর্ম্ম। উহাদের মন্ত্রদীক্ষা বেদাগম বহির্ভূত, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম বেদাগম বহির্ভূত, জাতকর্ম্মাবধি সমস্ত সংস্কার বেদ স্মৃতি বহির্ভূত এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্মও বেদ স্মৃতি বহির্ভূত। সর্ব্ব প্রকার সংস্কার ও শ্রাদ্ধকর্ম্মে ঠাকুরকে কড়া-ভোগ বা মালসা-ভোগ নিবেদন করাই উহাদের একমাত্র ক্রিয়া।

আমাদের মনের কথাকে আর একটু বিশদ করিবার নিমিত্তে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত পণ্ডিত-ভক্ত ছিলেন। তিনি বেদবিধি অনুসারেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং সামাজিকধর্ম্ম প্রতিপালনে তিনি শাস্ত্রতঃ বাধ্য ছিলেন না। তিনি যাহাদিগকে হরিনামামৃত পান করাইলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্ববৎ গৃহস্থধর্ম্মে থাকিলেন! গোস্বামিগণও গৃহস্থধর্ম্মেই আছেন। তদ্ভিন্ন বঙ্গ-

দেশের বিস্তর গ্রাম-নগরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি অনেক চৈতন্য-সাম্প্রদায়িক গৃহস্থ আছেন *। এই সমস্ত গৃহস্থগণ তাবতীয় নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া বেদাগম-বিহিতরূপে পালন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে চৈতন্য-কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম উপধর্ম্ম হয় নাই। তাহা হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু যাহারা হিন্দুসমাজ ত্যাগ পূর্ব্বক আকড়া-আশ্রমী হইয়াছে অথচ বৈষ্ণবী গ্রহণ ও সন্তানোৎপাদনাদি করিতেছে, তাহারা কাজে কাজেই এক উপধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা হিন্দুসমাজ হইতে বহির্ভূত হওয়ায় হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও হিন্দুসমাজস্থ গুরু পুরোহিত কর্ত্তৃক আর শাসিত হইতে পারে না—ইচ্ছাও করে না। কিন্তু নিতান্তপক্ষে বৈষ্ণবী গ্রহণের ও বালক বালিকাদিগের নামকরণাদি ক্রিয়ার প্রয়োজন। অতএব তাহারা সেই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনের স্বতন্ত্র পদ্ধতিকরিয়া লইয়াছে। সুতরাং এইস্থানে চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মটি উপধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে। যদি ঐআকড়া-আশ্রয়ী বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের অনুকরণে পূর্ণসন্ন্যাস গ্রহণ করিত অথবা যদি বৈষ্ণবীগ্রহণাদি না করিত; তবে তাহাদিগের উপধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইত না। চৈতন্যের সন্ন্যাসরূপ অত্যুন্নত ধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে পারে নাই, অথচ প্রাচীন সমাজও ভাল লাগে নাই; সুতরাং সেই সকল বৈষ্ণবেরা শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই

---

* চৈতন্যের সময় হইতেই যে এদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ সৃষ্ট হইয়াছে এস্থলে আমাদের উক্তির সে তাৎপর্য্য নহে। এদেশে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত বিস্তর ভদ্রবংশ পূর্ব্ব হইতে আছেন। তাঁহারা সকলেই বৈদিক ও তান্ত্রিক-ক্রিয়া করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভট্টাচার্য্য গুরুদিগের শিষ্য। গোস্বামিদিগের মন্ত্র শিষ্য নহেন।

একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু এই ভারতে এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাহা দর্শান নিষ্প্রয়োজন।

এই দৃষ্টান্তটিকে আমাদের লক্ষিত ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা কর। যোজনা করিলেই উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে যে, এখনকার নব্য-ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে উপধর্ম্ম রূপে পরিণত হইতেছে কি না। যাঁহারা বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, আগমাদি বিহিতরূপে ব্রহ্মোপাসক বা ব্রাহ্ম হইয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে আছেন এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম আর বিবাহ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে নির্ব্বাহ করিতেছেন; তাঁহাদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপধর্ম্ম নহে। তাহা হিন্দুধর্ম্মেরই মস্তকরূপে বিরাজ করিতেছে। তাঁহারাই শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ সেবক। রামমোহন রায়ও স্বয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠদিগকে শাস্ত্রের বচন দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন। "বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। আত্মতৃপ্তঃ স্বরেশানো লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ।" জ্ঞাননিষ্ঠেরা সর্ব্ব যুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত অথবা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন।" (পথ্যেঃ ১ম পঃ) এ স্থলে 'লোকযাত্রা' শব্দের অর্থ "সংস্কার, বিত্তোপার্জ্জন, পোষ্যবর্গপালন ও আহারাদি যাহা গৃহস্থের জন্যে ইহলোক নির্ব্বাহে আবশ্যক" (পথ্যেঃ ৫মঃ পঃ)। 'সংস্কার' শব্দের অর্থ বিবাহ প্রভৃতি দশসংস্কার। উক্ত মহাত্মা (পথ্যেঃ ১মঃ পঃ) আরো কহিয়াছেন যে, "জ্ঞাননিষ্ঠদের সর্ব্ব প্রকারে আবশ্যক আত্মচিন্তন এবং ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাস হয়, সন্ধ্যাবন্দনাদি চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়েন। অতএব ইহার পরিত্যাগের আবশ্যকতা কুত্রাপি লেখা যায় না"। প্রাগুক্ত বিবাহ প্রভৃতি এবং শেষোক্ত

সন্ধ্যাবন্দনাদি একত্রে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নামে কথিত হয়। সর্ব্ব প্রকার শ্রাদ্ধকর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের মধ্যগত, এবং উপরি উক্ত "আদি" শব্দ তাহারই জ্ঞাপক। যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন বা ব্রহ্মোপাসনা করেন, অথচ ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার আচরণ করেন, তাঁহারাই শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ সেবক ও মর্ম্মজ্ঞ। তাঁহাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম উপধর্ম্ম নহে।

কিন্তু যে সকল ব্রাহ্ম এই বর্ত্তমান কালে হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র আশ্রম সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা বিবাহ শ্রাদ্ধাদি আবশ্যকীয় লোকযাত্রা সমূহ স্বকপোলকল্পিত অভিনব পদ্ধতি দ্বারা সম্পাদন করিতেছেন, যাঁহারা "শাস্ত্রানু-সারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়" (অনুষ্ঠানে) রামমোহন রায়ের এই উপদেশাতিক্রম পূর্ব্বক বিচরণ করি-তেছেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম উপধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম আর হিন্দুধর্ম্ম নহে। তথাপি যদি কেহ তাহাকে বল পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম বলেন, তাহা হইলে বুঝা উচিত যে, তাহা হিন্দুধর্ম্মরূপ বিরাটশরীরের পাদ, কুক্ষি, উদর, বাহু হইতে স্বতন্ত্র একটা ছিন্ন মস্তক মাত্র হইবে। সুতরাং তাহাকে হিন্দুধর্ম্মই বলা যাইবে না।

উপধর্ম্ম সমূহের অনেকগুলি অবশ্যম্ভাবী দোষ আছে। প্রথমতঃ তাহার সহিত সমাজ পুষ্ট হয়না। দ্বিতীয়তঃ তন্মতাব-লম্বী ব্যক্তিদিগের মধ্যে সঙ্কর সৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ তাঁহা-দের মধ্যে অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভাব ও অনৌদার্য্য প্রকাশ পায়। চতুর্থতঃ তাঁহাদের বংশে দৈবাৎ মূর্খ ও পাষণ্ড জন্ম গ্রহণ করিলেই সর্ব্বনাশ। এবং পঞ্চমতঃ ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞ

না হইয়াও অনেক জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারের ও বিবাহাদির সুবিধা জন্য তাঁহাদের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ক্রমে নাস্তিকতা বিস্তার করে। এই সকল ধীর ভাবে চিন্তাপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞ সাধু ও সৎকুলোদ্ভব যুক্তি-পরায়ণ যুবা তাঁহাদের সম্প্রদায় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে দূরে অবস্থিতি করিবেন। যদি ব্রহ্মজ্ঞানালোচনায় বা ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় মতি হয় তবে সমাজের মধ্যে থাকিয়াই বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত সগুণ বা নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান সাধন পূর্ব্বক পূর্ব্ব-পুরুষদিগের এবং ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবেন। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মের নিত্যনৈমিত্তিকাদি লোকাচারকে মনেতেও লঙ্ঘন করি-বেন না। ভগবান ভারতের সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করুন।

---

# বিজ্ঞাপন।

আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রাগুক্ত উপদেশ সমূহে ব্রহ্মোপাসনার লক্ষণ, নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের উপায়, প্রতিমাপূজা, অবতার, শৌচাচার, অদৃষ্ট, সৃষ্টি, প্রলয়, পরলোক প্রভৃতি দুরূহ তত্ত্ব সমূহ স্পর্শ করি নাই। তৎসম্বন্ধে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র উপদেশ সকল প্রকাশ করিব। তন্মধ্যে আমরা সৃষ্টি বিষয়ক তত্ত্বসম্বন্ধে পূর্ব্বে স্বতন্ত্র সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি। সেই গ্রন্থ ও আমাদের কৃত বেদান্ত প্রবেশ দুষ্প্রাপ্য নহে। তদুভয় এবং আমাদের নূতন প্রকাশিত বেদান্তদর্শন একত্রে পাঠ করিলে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের জিজ্ঞাসু যুবাগণের বিস্তর উপকার হইবে।